ডা. ইসরার আহমাদ

অনুবাদ | ফাহাদ আবদুল্লাহ

দ্বীন কায়েমের নববি রূপরেখা

ডা. ইসরার আহমাদ

অনুবাদ

ফাহাদ আবদুল্লাহ

প্রকাশকের কথা

আরবের মরুবেষ্টিত ছোট্ট নগরী মক্কাতুল মুকাররমা থেকে যাত্রা শুরু হয় ইসলামের। অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্যকে পদানত করে ইসলাম; প্লাবিত করে পুরো পৃথিবীর প্রায় অর্ধ আবাদিকে। আর বাকি জনপদেও পৌঁছে যায় তাকবিরের বলিষ্ঠ আওয়াজ। যে প্রাণশক্তির জোরে ইসলাম অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রসর হয়েছিল, ইতিহাসের পথপরিক্রমায় পরবর্তী সময়ের মুসলিমরা সে শক্তিকে যথাযথভাবে ধারণ করতে পারেনি। ফলে উম্মাহর জীবনে নেমে আসে পতন আর বঞ্চনা। সেই বেদনাদায়ক অধ্যায় প্রলম্বিত হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে বিংশ শতকের প্রারম্ভিকায়।

পতনের সে গহ্বর থেকেই ইসলামের পুনর্জাগরণ-প্রয়াস শুরু হয় মুসলিম বিশ্বের নানা প্রান্ত—আরব, মিশর, আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, হিন্দুস্তান—থেকে। পুনর্জাগরণপ্রয়াসী ইসলামি আন্দোলনসমূহ গত শতাব্দী জুড়েই নানান নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গেছে; বর্তমানেও তা চলমান। ইসলামি আন্দোলনের সে পথযাত্রায় মোটাদাগে দুটি মত চর্চিত হয়ে আসছে। একটি হলো—প্রচলিত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে ইসলামের পক্ষে জনমত গঠন করা এবং তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কলুষিত ব্যবস্থার পরিবর্তন করা। আরেকটি মত হলো—জনমত গঠন ও যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয়ের পর কায়েমি পঙ্কিল ব্যবস্থার পরিবর্তনে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা।

প্রথমোক্ত মতের ভিত্তিতে ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতি করে আসছে। বিপরীতে ডা. ইসরার আহমাদ-সহ একদল আলিম-গবেষক প্রচলিত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করে ব্যাপক দাওয়াত ও তারবিয়াতের মাধ্যমে ইসলামের পক্ষে জনমত গঠন করে গণ-আন্দোলনের রীতিকে যথার্থ মনে করেছেন। প্রখ্যাত লেখক, চিন্তক ও রাজনীতিবিদ মাওলানা আবদুর রহীম রহ. জীবনের শেষ প্রান্তে এই মতকে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ বিষয়ে কয়েকটি ছোটো পুস্তিকাও লিখেছেন।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, উভয় মতের ধারক মনীষীদের লক্ষ্য কিন্তু একই—ইসলামের বিজয়। দাওয়াত, তানজিম ও তারবিয়াতের মাধ্যমে ইসলামি শাসনব্যবস্থার পক্ষে জনমত গঠন করতে হবে—এ বিষয়েও তারা একমত। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জনমত ও শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমই সকলের মনজিলে মকসুদ। তারা মূলত যে বিন্দুতে গিয়ে নিজেদের পথরেখায় ভিন্নতা অবলম্বন করেছেন তা হলো—জনমত গঠনের পদ্ধতি।

মনজিলের বিন্দু যেহেতু একই রেখায় মিলিত, সেহেতু পারস্পরিক চিন্তার বিনিময়, নিরীক্ষা, আলাপ একটি ফলপ্রসু ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়। সেই চিন্তার দিগন্তে ডা. ইসরার আহমাদের 'রাসূলে ইনকিলাব কা তরিকে ইনকিলাব' বইটি দারুণ একটি সংযোজন। এ বইয়ে তিনি সিরাতে নববির আলোকে দ্বীন কায়েমের রূপরেখা অঙ্কন করেছেন। তিনি চমৎকার মুনশিয়ানায় বর্ণনা দিয়েছেন ইনকিলাবের ধাপ-পরিধাপগুলোর। এই আলোচনা দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে সম্পৃক্ত নেতাকর্মীদের চিন্তার রাজ্যকে দোলায়িত করবে, প্রাণিত করবে তাদের উদ্যমকে আর শানিত করবে তাদের শপথ, ইনশাআল্লাহ।

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখি এবং তাঁর ওপরই ভরসা করি।

আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি—আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও আমলের মন্দ প্রভাব থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে সরল পথে পরিচালিত করেন, তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না। আর যাকে তিনি পথহারা করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক ও অবিনশ্বর; তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

هُوَ الَّذِیْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿۳۳﴾

তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও দ্বীনে হকসহ পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি একে অন্য সব দ্বীনের ওপর বিজয়ী করেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (সূরা তাওবা : ৩৩)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

> আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি শুধু; যদিও অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সূরা সাবা : ২৮)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

> অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে 'উসওয়াতুন হাসানাহ'—উত্তম আদর্শ; তাদের জন্য, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রত্যাশা রাখে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে। (সূরা আহযাব : ২১)

প্রিয় পাঠক, সরাসরি মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে একটি প্রশ্ন রেখে যেতে চাচ্ছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আজ মুসলিম জাতির সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজনটা কীসের? সবাই একটু ভেবে দেখুন তো, ধন-সম্পদ, শাসন, শিক্ষাদীক্ষা, টেকনোলজি বা গণতন্ত্র—এসবের কোনোটি কি আমাদের সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজনের অংশ? আমার পর্যবেক্ষণ বলছে, বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন হচ্ছে ইনকিলাবের (ইসলামি বিপ্লব) সেই রূপরেখা বোঝা, উপলব্ধি করার চেষ্টা করা—যে রূপরেখা বাস্তবায়ন করে মুহাম্মাদ সা. ইনকিলাব ঘটিয়েছিলেন।

আমার চিন্তাভাবনা ও দর্শনের এই দিকটি তো আপনাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, বর্তমানে পুরো বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর যে পতনোন্মুখ অবস্থা, এটা আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের ওপর আপতিত শাস্তি। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর মনোনীত দ্বীনের

প্রতিনিধি বানিয়েছিলেন আমাদের, কিন্তু আমরা সেই সম্মান রক্ষা করিনি। যে দ্বীনের প্রতিনিধি হওয়ার সম্মান লাভ করেছি, আজ পুরো পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখাতে পারব—এমন একটি রাষ্ট্রেরও অস্তিত্ব নেই, যেখানে এই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বা যার ব্যাপারে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, 'দেখুন সবাই, ভালোভাবে দেখুন! এ হচ্ছে মুহাম্মাদি শাসনব্যবস্থা। এ হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত দ্বীন প্রতিষ্ঠার বরকত!' যেহেতু আমরা এমন কিছু করতে পারিনি, তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে আপতিত শাস্তির শিকার হয়েছি।

একটা কথা ভালোভাবে বুঝে নিন! আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ভারত, আমেরিকাসহ বিশ্বের কোনো পরাশক্তিরই আমাদের কিছু বিগড়ানোর ক্ষমতা নেই। তাহলে বোঝা গেল, পৃথিবীতে এখন আমাদের যে করুণ দশা, আমরা যে পতনোন্মুখ অবস্থার শিকার; সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে। আর তার কারণ হলো, আমরা আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করছি না। উলটো নিজেদের কৃতকর্মের মাধ্যমে একে ভুলভাবে উপস্থাপন (misrepresent) করছি।

তো, এখন এর সমাধান কী? কীভাবে আমরা এই করুণ দশা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি? এর একটিই সমাধান রয়েছে, এই করুণ দশা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটিই পথ খোলা রয়েছে, আর তা হচ্ছে—নিদেনপক্ষে পৃথিবীর কোনো একটি রাষ্ট্রে হলেও সঠিকভাবে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এরপর পুরো পৃথিবীকে আহ্বান করে বলা যে, 'দেখো, দেখো সবাই! এ হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম! এ হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত দ্বীন! এ হচ্ছে আমাদের হারানো গৌরব!'

রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পর্যায়ে পাকিস্তানেরব্যাপারে আমার অবস্থান সম্পর্কে আশা করি অবগত আছেন আপনারা। আমি মনে করি, পাকিস্তানের অধঃপতন শুরু হয়েছে। কারণ, পাকিস্তান তার প্রতিষ্ঠার

মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে ছিটকে পড়েছে। তবে হ্যাঁ, অধঃপতন শুরু হলেও আল্লাহর পক্ষ থেকে এখনও একটি সুযোগ আছে। মনে রাখবেন, পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও উন্নতির মাত্র একটি পথই খোলা। আর তা হচ্ছে, এখানে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন।[১] মূলত পাকিস্তান এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম জিন্নাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন—

> আমাদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পৃথিবীর সামনে ইসলামে স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সমতার যে মূলনীতি ও দর্শন রয়েছে—তার প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা।

একই কথা বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও পাকিস্তানের রূপকার আল্লামা ইকবালও বলেছিলেন।

অন্যদিকে দেখুন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুগের পরাশক্তি আমেরিকা ও তার সহযোগীরা মরিয়া হয়ে আছে, পৃথিবীর কোথাও যেন ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রকাশ না ঘটে! যেখানেই ইসলাম শক্তিশালী হচ্ছে, নিজেদের সবটুকু শক্তি ব্যয় করে তা দমিয়ে দিচ্ছে। আল্লামা ইকবাল তাদের এই অবস্থার কথাই মূলত এভাবে বলেছিলেন—

عصرِ حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف -

ہو نہ جائے آشکارا شرعِ پیغمبر کہیں

যুগের (হোবলদের) মনোবাঞ্ছা কিন্তু সতত এমনই হয়।
আতঙ্ক তাদের—কোথাও না আবার শরিয়তে মুহাম্মাদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

---

১. লেখক এখানে কথাগুলো পাকিস্তানিদের উদ্দেশে বললেও অন্য সব মুসলিম রাষ্ট্রের জন্যও এগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য ও আমলযোগ্য।—অনুবাদক

আজ আমেরিকাসহ পুরো ইউরোপ এই শঙ্কায় শঙ্কিত, পৃথিবীর কোথাও না আবার ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কারণ, এটা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট একটা বিষয় যে, جاء الحق-এর ধাপ সম্পন্ন হলে زهق الباطل-ই তার অনিবার্য ফল হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যখন সত্য সমাগত হয়, তখন মিথ্যার অপসৃত হওয়াটা অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই শঙ্কা ও আশঙ্কা তাদের এমনভাবে গ্রাস করেছে যে, বলা যায়—তারা নিজেদের পুরো গ্লোবাল পলিসিই একে ঘিরে আবর্তিত করতে শুরু করেছে। কারণ, তারা ভালোভাবেই বুঝতে পারছে, মুসলিমবিশ্বে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দীপনা আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠতে শুরু করেছে। একে তারা সাধারণ কোনো উদ্দীপনা মনে করে না, ভয়ংকর কিছু মনে করে; কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো—সেই উদ্যমকে এখনও সঠিক পথে নির্ভুল পন্থায় যথাযথভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। মনে রাখতে হবে, শুধু উদ্যম-উদ্দীপনা ততক্ষণ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, যতক্ষণ-না তা কাজে লাগানোর সঠিক কোনো পথ ও পন্থা পাওয়া যায়।

এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সঠিক কর্মপন্থা অবলম্বন করা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন। আর সঠিক কর্মপন্থা তো সেটাই হবে, যেটা সিরাতুন নবি ﷺ থেকে গ্রহণ করা হবে। আমরা সেই হাদিসগুলো একত্রিত করে ব্যাপকভাবে তা প্রচার-প্রসার করেছি, যে হাদিসগুলো থেকে এই বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে, কিয়ামতের আগে পুরো পৃথিবীতে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। সমগ্র বিশ্বে অবিশ্বাসীদের নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার (New World Order) নয়; বরং ইসলামের জাস্ট ওয়ার্ল্ড অর্ডার (Just World Order)-এরই বিজয় হবে।

তারা যে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তা আসলে জিও (ইহুদি) ওয়ার্ল্ড অর্ডার। এদের ওয়ার্ল্ড অর্ডারের বিপরীতে ইসলামিক ওয়ার্ল্ড অর্ডার হচ্ছে একটি সুবিচারপূর্ণ ও ইনসাফময় শাসনব্যবস্থা; যার ব্যাপারে রাসূল ﷺ সুসংবাদ দিয়েছেন, কিয়ামতের আগে তা পুরো বিশ্বে ছেয়ে যাবে, প্রবলতা লাভ করবে। পুরো পৃথিবীতে তা বিজয়ী হয়ে যাবে; যেমনিভাবে রাসূল ﷺ-এর হাতে জাজিরাতুল আরবে—جاء الحق وزهق الباطل (সত্য সমাগত হয়েছে, মিথ্যা অপসৃত)-এর অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। এখন কথা হচ্ছে, পৃথিবীর কোনো একটি রাষ্ট্রে হলেও এ শাসনব্যবস্থা কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে? এর উত্তরে ইমামু দারিল হিজরাহ ইমাম মালিক রহ.-এর এই উক্তিটি বলা যায়—

لن يُصلِحَ آخرَ هذه الأمة إلا ما أصلَحَ أولَها

> এ উম্মাহর শেষভাগের সংশোধনও কেবল সে পন্থায়ই হতে পারে, যে পন্থায় হয়েছিল প্রথমভাগের।[২]

যেহেতু এই উম্মাহর শেষভাগের সংশোধন কেবলই প্রথমভাগের সংশোধনের পন্থায় সম্ভব; তাই আজও ইনকিলাবের জন্য আমাদের প্রথমে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে রাসূল ﷺ-কর্তৃক সংঘটিত বিপ্লবের কর্মপন্থা। তারপর তা প্রয়োগ (apply) করতে হবে।

এতক্ষণ সামান্য যা কিছু বলেছি, সবই ভূমিকা হিসেবে বলেছি—যাতে আজকের এই আলোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে আপনাদের কষ্ট না হয়। বর্তমানে ইসলামকে বিজয়ী করতে মানুষের আগ্রহের অভাব নেই, কিন্তু সঠিক কর্মপন্থা জানা না থাকার কারণে ইসলামি আন্দোলনের কর্মীরা পথ হারিয়ে ফেলছে। দিশেহারা হয়ে ঘুরছে।

---

২. *ইকতিদাউস সিরাত*, ইবনে তাইমিয়া : ৩৬৭।

কবির ভাষায় তাদের বর্তমান অবস্থা—

نشانِ راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو۔

ترس گئے ہیں کسی مردِ راہ داں کے لیے

যারা আসমানে জ্বলে থাকা ওই তারকারে পথ দেখাত,
তারাই আজ কোনো রাহবারের পথ চেয়ে অপেক্ষায় রত।

ইসলামি বিপ্লবের জন্য সঠিক কর্মপন্থা অনুসরণ করতে হবে; যা কেবলই রাসূল ﷺ-এর আদর্শে রয়েছে। আল্লাহ বলেন, "অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে 'উসওয়াতুন হাসানাহ'—উত্তম আদর্শ।" এ 'উসওয়াতুন হাসানাহ' থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে; যা এ আয়াতেরই পরের অংশে আল্লাহ বলে দিয়েছেন, 'তাদের জন্য, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রত্যাশা রাখে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে।' অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর 'উসওয়াতুন হাসানাহ' থেকে তারাই উপকৃত হতে পারবে–

[১] যারা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশা রাখে,

[২] পরকালে বিশ্বাস রাখে এবং

[৩] অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে। আল্লাহর জিকির করে।

এই তিন শ্রেণির লোকেরাই মূলত 'উসওয়াতুন হাসানাহ' থেকে উপকৃত হতে পারবে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন, কুরআন হচ্ছে—هدى للناس—সমগ্র

মানবজাতির জন্য হিদায়াত; কিন্তু তার হিদায়াত থেকে কেবল তারাই উপকৃত হতে পারবে, যাদের মধ্যে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) রয়েছে। এ জন্যই মূলত কুরআনের সূচনাতেই স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে এটি—هدى للمتقين—অর্থাৎ এই কুরআন শুধু মুত্তাকিদের জন্যই হিদায়াতস্বরূপ।

ইনকিলাবের অর্থ

ভূমিকা হিসেবে যে আলাপটা করেছি, এরপর বোঝা প্রয়োজন, ইনকিলাব (ইসলামি বিপ্লব) কাকে বলে। ইনকিলাবের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে—বদল, পরিবর্তন, বিদ্রোহ ও বিপ্লব। শব্দটিকে আমরা অন্য যেকোনো শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করতে পারি। যেমন—ইলমি ইনকিলাব (জ্ঞানবিপ্লব), সাকাফাতি ইনকিলাব (সাংস্কৃতিক বিপ্লব), ফৌজি ইনকিলাব (সেনাবিদ্রোহ) প্রভৃতি। তবে ইনকিলাবের পারিভাষিক অর্থে এসব ব্যবহারের কোনো অবকাশ নেই। কারণ, পারিভাষিক অর্থে ইনকিলাব হচ্ছে— কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থার কোনোটিতে অথবা সবগুলোতেই মৌলিক পরিবর্তন আনা।

বর্তমান সময়ে মানবজীবনকে দুভাগে বিভক্ত মনে করা হয়। তন্মধ্যে এক ভাগ ব্যক্তিগত জীবনকেন্দ্রিক, আরেক ভাগ সমাজকেন্দ্রিক। প্রথম ভাগের সম্পর্ক ধর্মের সঙ্গে; যা আকিদা-বিশ্বাস (Dogmas), ইবাদত (Rituals) ও সামাজিক রীতিনীতিকে (Social Customs) শামিল করে। বিশ্বব্যবস্থা এই ভাগে অর্থাৎ ধর্মকেন্দ্রিক ভাগে কারও ব্যক্তিস্বাধীনতায় কোনোরকম হস্তক্ষেপ করে না। এ ক্ষেত্রে সবাই স্বাধীন। যার যেমন ইচ্ছা ধর্মবিশ্বাস লালন করবে। কারও ইচ্ছা হলে এক প্রভুতে বিশ্বাস রাখবে। কারও ইচ্ছা হলে শত প্রভুতে বিশ্বাসী হবে। আবার কারও মনে চাইলে কোনো প্রভুতেই বিশ্বাস রাখবে না।

এমনিভাবে যার যেভাবে ইচ্ছা ইবাদত-বন্দেগি-উপাসনা করবে। কারও ইচ্ছা হলে নির্জনে তপস্যা করবে, ধ্যানমগ্ন হবে। যার ইচ্ছা প্রতিমাপূজা করবে। আবার কেউ চাইলে অদৃশ্য প্রভুর ইবাদত করবে।

একইভাবে ইবাদতের রীতিনীতিতেও স্বাধীনতা রয়েছে। কারও ইচ্ছে হলে সে রোজা রাখবে, নামাজ পড়বে। কারও ইচ্ছে হলে সে মন্দিরে যাবে অথবা চার্চে। মোটকথা, এ ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। উলটো বলা যায়, ব্যাপক স্বাধীনতা রয়েছে। তারপর সামাজিক প্রথা বা উৎসবের বিষয়ে আসা যাক। এ ক্ষেত্রেও কোনো ধরাবাঁধা নেই। যেমন, বিয়ের ক্ষেত্রে; কেউ ইজাব-কবুলের তরিকায় বিয়ে পড়াক অথবা আগুনের পাশে চক্কর কাটিয়ে পড়াক, কারও কোনো সমস্যা নেই। মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে; কেউ মরদেহ মাটিতে দাফন করে দিক অথবা জ্বালিয়ে দিক, এতেও কোনো বিধিনিষেধ নেই।

জীবনের দ্বিতীয় ভাগটি সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র ও রাজনীতি অর্থাৎ সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে; যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক রীতিনীতি ও বিধানকে (The Politico-Socio-Economic System) শামিল করে। ধর্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এর নাম হচ্ছে সেক্যুলারিজম। এখানে এটি সুস্পষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি যে, তাত্ত্বিকভাবে সেক্যুলারিজমের অর্থ কিন্তু ধর্মহীনতা নয়; বরং এটি 'সর্বধর্ম-বিশ্বাসী', আবার কোনো ধর্মেই বিশ্বাসী নয়—এমন একটি সংবিধান বা কায়দা-কানুনের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, সেক্যুলারিজমে কখনও কোনো ধর্মেরই পরোয়া করা হয় না; আবার সব সময় সব ধর্মের মন জুগিয়েও চলা হয়। সেক্যুলারিজমে সব ধর্মই গ্রহণযোগ্য। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশও কিন্তু বলেছিল, We are ready to embrace Islam—'একটি ধর্ম হিসেবে ইসলাম নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।'

আরও স্পষ্ট করে বললে তাদের কথা হচ্ছে, মুসলমানরা আমেরিকায় এসে সিনাগগ ও চার্চ ইত্যাদি ক্রয় করে সেগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে, এতে আমরা কোনো আপত্তি করছি না। এখানে এসে তারা বিশালসংখ্যক খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী আমেরিকানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও ধর্মান্তরিত করে মুসলমান বানিয়ে ফেলেছে, এতেও আমরা কোনো অভিযোগ তুলছি না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, কেন তারা আপত্তি বা অভিযোগ করছে না? কারণ, শুধু একটি ধর্ম হিসেবে ইসলামের সঙ্গে তাদের কোনো লড়াই নেই, কিন্তু একটি শাসনব্যবস্থা (The Politico-Socio-Economic System) হিসেবে ইসলামকে তারা বিলকুল বরদাশত করতে পারে না। ইসলামের এ রূপটিকেই তারা ফান্ডামেন্টালিজম বলে অভিহিত করে। আর যেহেতু কিছু ফান্ডামেন্টালিস্ট লোকদের অনুসৃত কর্মপন্থার ওপর সন্ত্রাসবাদের দাগ লেগে গেছে, তাই তারা ফান্ডামেন্টালিজমকে সন্ত্রাসবাদ (Terrorism) হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কখনও তারা 'সন্ত্রাসবাদ'-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তো, কখনও 'মৌলবাদ'-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে; তবে বাস্তবে এসব যুদ্ধ হচ্ছে ইসলামি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আবারও বলছি, এসব যুদ্ধ ইসলামের আকিদা, ইবাদত ও অন্যান্য রীতিনীতির বিরুদ্ধে নয়; বরং এসব যুদ্ধ ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

আধুনিক বিশ্বের পরিভাষায় ইনকিলাব (বিপ্লব) এই সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনাকে বলে। ধর্মীয় ময়দানে কোনো বড়ো থেকে বড়ো পরিবর্তন আনাকেও ইনকিলাব বলা যায় না। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ভালোভাবে বুঝে নিন! মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় পরিবর্তন ঘটেছিল ৩০০ খ্রিষ্টাব্দে,

যখন কুসতানতিনে আজম (Constantine the Great) খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং তার সঙ্গে পুরো সাম্রাজ্যও খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী হয়ে গিয়েছিল। মানবসভ্যতায় ধর্মের ইতিহাসে এত বড়ো পরিবর্তন (conversion) আর কখনও হয়নি। রোমান সাম্রাজ্য তখন তিন-তিনটি মহাদেশ—অর্থাৎ পুরো উত্তর আফ্রিকা, পুরো পূর্ব ইউরোপ ও পুরো পশ্চিম এশিয়া জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এত বড়ো ধর্মীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, কিন্তু কখনও একে বিপ্লবের ইতিহাসে স্থান দেওয়া হয়নি। কারণ, এই ধর্মীয় পরিবর্তনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় তেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসেনি। ইনকিলাব বা বিপ্লব (Revolution) বলা হবে সেই পরিবর্তনকে, যা কোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকেন্দ্রিক হবে এবং তা মৌলিক ধরনের হবে। বুনিয়াদি পর্যায়ের হবে।

পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের একমাত্র নজির : নববি বিপ্লব

এখন আমরা পৃথিবীবিখ্যাত কয়েকটি বিপ্লব নিয়ে পর্যালোচনা করব। এর মধ্যে 'ফরাসি বিপ্লব' খুবই প্রসিদ্ধ এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তা আসলেই বিপ্লব ছিল; কিন্তু এতে শুধু রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছিল। সেখানে ধর্ম আগেও খ্রিষ্টবাদ ছিল, পরেও তা-ই। সামাজিক অবস্থা বা কাঠামোতেও (Social Structure) কোনো পালাবদলের হাওয়া লাগেনি। অতএব, বোঝা গেল, ফরাসি বিপ্লবে কেবল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছিল।

আরেকটি বিখ্যাত বিপ্লব হচ্ছে রাশিয়ার 'বলশেভিক বিপ্লব', যা ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল। এই বিপ্লবের মাধ্যমে শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। ব্যক্তিমালিকানার বিলুপ্তি ঘটিয়ে স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পদের মালিক হয়ে যায় রাষ্ট্র। ভালো করে মনে রাখুন, এই দুটি হচ্ছে বিপ্লব। বিপরীতে পুরো রোমান সাম্রাজ্য একই সময়ে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে যাওয়াটা বিপ্লব নয়।

এবার আসুন, আমরা মুহাম্মাদ ﷺ-কর্তৃক সংঘটিত ইনকিলাব বা বিপ্লবকে পর্যালোচনা করে দেখি। প্রথমে আমরা দেখব, রাসূল ﷺ আসলেই কোনো বিপ্লব করেছিলেন, নাকি আমরা কেবল ভক্তি ও ভালোবাসা থেকেই এমনটা দাবি করে থাকি?

বাস্তবতা হচ্ছে, রাসূল ﷺ মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো বিপ্লব করেছিলেন। এই দাবিটি আমরা মুখের বুলিতে নয়; বরং বিশ্লেষণ ও গভীর গবেষণা (Cold Analysis) দিয়ে প্রমাণ করতে চাই। বিষয়টি উপস্থাপন করতে প্রথমে আমরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাক্ষ্য পেশ করব। কারণ, বলা হয়—الفضل ماشهدت به الاعداء— অর্থাৎ 'প্রকৃত সম্মান হচ্ছে তা, যা দুশমনও স্বীকার করে নেয়'। বন্ধু ও অনুসারীরা তো সবকিছুরই প্রশংসা করে; প্রকৃত প্রশংসা তো হচ্ছে, যার স্বীকারোক্তি শত্রুরাও দেয়। সিংহহৃদয় সম্রাট রিচার্ড যদি সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির প্রশংসা করে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, আসলেই সালাহুদ্দিন আইয়ুবি প্রশংসার যোগ্য মহান সেনানায়ক ও সুলতান ছিলেন।

এম. এন. রায় ছিলেন একজন বাঙালি হিন্দু। তিনি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিস্ট অর্গানাইজেশনের গুরুত্বপূর্ণ সভ্য ছিলেন। ১৯২০ সালে লাহোরের ব্র্যাড-ল মিলনায়তনে (Bradlaugh Hall) 'ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা' (The Historical Role of Islam) শিরোনামে দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেছিলেন—

> এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো বিপ্লব সংঘটিত করেছেন মুহাম্মাদ ﷺ।

এখানে আপনাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, ভদ্রলোক কিন্তু মুসলিম নন; তিনি বাঙালি হিন্দু এবং কট্টর কমিউনিস্ট। তারপরও তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে এটা স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো বিপ্লব সংঘটিত করেছেন মুহাম্মাদ ﷺ। এ তো বললাম ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ—অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে ২০ বছর পরের কথা। এবার তাহলে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ—অর্থাৎ

শতাব্দীর সমাপ্তি থেকে ২০ বছর আগের কথা বলি। আমেরিকান গবেষক ডা. মাইকেল এইচ. হার্ট (Michael H. Hart) 'দ্য হ্যান্ড্রেড' রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি মানবসভ্যতার ৫ হাজার বছরের ইতিহাস থেকে এমন ১০০ জন মনীষীকে নির্বাচন (selection) করে তাদের জীবনী বিন্যস্ত (gradation) করেছেন, যারা মানবসভ্যতার গতি বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছেন।

এই বিন্যাসে মাইকেল এইচ. হার্ট প্রথমেই রেখেছেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর নাম। লেখক একজন খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী। আমার জানামতে, তিনি এখনও জীবিত আছেন এবং নিউইয়র্কের ম্যানহাটন (Manhatton) শহরে বসবাস করছেন।[৩] তার রচিত গ্রন্থটি পুরো পৃথিবীতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও প্রসারলাভ করেছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, প্রকাশের পরপরই গ্রন্থটি খুব দ্রুতই দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। ধারণা করা হয়, বিশেষ একটি চক্র ষড়যন্ত্র করে এটি গায়েব করে দিয়েছিল। কারণ, সেই গ্রন্থে তিনি মাসিহ আ. (খ্রিষ্টানদের কাছে যিনি প্রভুর একমাত্র সন্তান)-কে তৃতীয় নম্বরে রেখেছেন আর মুহাম্মাদ ﷺ-কে রেখেছেন প্রথম নম্বরে। খ্রিষ্টানবিশ্ব এটা মেনে নিতে পারেনি; পারেনি বরদাশত করতে। মুহাম্মাদ ﷺ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

> My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels.

---

৩. ডা. ইসরার আহমাদ এ বক্তব্যটি দিয়েছিলেন ১৯৮৪-৮৫ সালের দিকে। —অনুবাদক

বিশ্বনেতৃত্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় মুহাম্মাদ সা.-এর নাম শীর্ষস্থানে রাখাতে পাঠকরা যারপরনাই বিস্মিত হয়েছেন। অনেকে আবার আপত্তিও তুলেছেন। তবে অনস্বীকার্য বাস্তবতা হচ্ছে—তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ধর্মীয় ও জাগতিক—উভয় দিক বিবেচনায় মানবসভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে সফলতম ব্যক্তি ছিলেন।

ডা. মাইকেল এইচ. হার্টের মতে, মানবজীবনের দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দিক আছে। একটি ধর্ম, আখলাক-চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতার দিক। আরেকটি সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজের দিক। এ দুটি দিক থেকেই মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে সফল (Supremely Successful) ও প্রভাবশালী ব্যক্তি শুধু এবং শুধুই একজন আর তিনি হচ্ছেন—মুহাম্মাদ ﷺ।

যাদের সাধারণত মনীষী বা অনুকরণীয় ব্যক্তি মনে করা হয়, তাদের মাহাত্ম্য কোনো একদিকে ফুটে ওঠে। যেমন, ইবাদত-বন্দেগি ও কুপ্রবৃত্তি দমনে গৌতম বুদ্ধকে মহান মনে করা হয়। চারিত্রিক শুচিতা শিক্ষাদানে মাসিহ আ.-কে মহৎ মনে করা হয়। রাষ্ট্র, শাসন ও রাজনীতিতে এই দুজনের কোনো অবদান ছিল না। অপরদিকে বিজয় ও দেশ দখলে আলেকজান্ডার (Alexander the Great)-কে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। এমনিভাবে আতিলা (Attila), চেঙ্গিস খান ও দ্য গ্রেট আকবরও নিজ নিজ জায়গায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তারা ছাড়াও আরও অনেক শাসক ও বিজেতা গত হয়েছে; কিন্তু ধর্ম, আখলাক-চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতায় তাদের বিশেষ কোনো অবদান ছিল? এসব ক্ষেত্রে অবদান তো দূরের কথা, বহু ক্ষেত্রে তাদের কর্মকাণ্ড আরও

বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। সভ্যতার ইতিহাসের সামগ্রিক দিক বিবেচনায় কেবল একজন ব্যক্তিই মহৎ, প্রভাবশালী ও সফলতম সাব্যস্ত হন আর তিনিই হচ্ছেন—মুহাম্মাদ ﷺ।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাক্ষ্যসমূহের মধ্যে তৃতীয় যে সাক্ষ্যটির কথা আমি প্রায় বলে থাকি, সেটি হারবার্ট জর্জ ওয়েলসের। অবশ্য, তার *A Concise History of The World* গ্রন্থের যে বাক্যটির উদ্ধৃতি আমি দিয়ে থাকি, নতুন সংস্করণে সেটি মুছে দেওয়া হয়েছে। মূলত কোনো দুশমনের জবানে এরচেয়ে বড়ো প্রশংসা আর হতেই পারে না। কারণ, হারবার্ট জর্জ ওয়েলস আদতে রাসূল ﷺ-এর নিকৃষ্টতম দুশমনদের একজন। রাসূল ﷺ-এর শানে সে সালমান রুশদি ও তসলিমা নাসরিনের চেয়েও জঘন্য ভাষা ব্যবহার করেছিল। কিন্তু যখন সে রাসূল ﷺ-এর বিদায় হজের ভাষণের নিম্নোক্ত বাক্যগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করে, তখন তাকেও হাঁটু গেঁড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রশংসা করতে হয়েছে। সে ভাষণে রাসূল ﷺ বলেছিলেন—

> يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى
>
> হে মানবসকল—মনে রেখো, তোমাদের সকলের প্রতিপালক এক এবং তোমাদের পিতাও এক। মনে রেখো, না কোনো আরব অনারবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে, আর না কোনো অনারব আরবের ওপর। না কোনো উজ্জ্বল বর্ণের মানুষ কালো বর্ণের মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে আর না কোনো কালো বর্ণের মানুষ সাদা বর্ণের মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। (মুসনাদে আহমাদ : ২২৯৭৮)

হারবার্ট জর্জ ওয়েলস যদিও খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী; কিন্তু বিদায় হজের ভাষণের কথা বলার পর সে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে—

> যদিও ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও স্বাধীনতার নীতিকথা পৃথিবীতে বহুকাল আগেও অনেক দেওয়া হয়েছিল এবং এমন উপদেশমূলক কথা আমরা মাসিহের উপদেশমালাতেও অনেক পেয়ে থাকি। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে, মুহাম্মাদই এমন এক মনীষী, যিনি সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম এই মূলনীতির ওপর একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তাহলে দুশমনদের সাক্ষ্যের মাধ্যমেও এই কথা প্রমাণিত হয়ে গেল, যে বিপ্লব মুহাম্মাদ ﷺ সংঘটিত করেছিলেন, তা মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো ও সফলতম বিপ্লব ছিল। মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিপ্লবের সঙ্গে ফরাসি ও রুশ বিপ্লবের তুলনা করে দেখুন, তাহলে আপনিও বুঝতে পারবেন, ফরাসি বিপ্লবে শুধু রাজনৈতিক ব্যবস্থা আর রুশ বিপ্লবে শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ-এর সংঘটিত বিপ্লবে সবকিছু আমূল বদলে গেছে। ধর্ম, বিশ্বাস, প্রথা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সবকিছু বদলে গেছে—একইভাবে সমাজও বদলে গেছে। কোনো কিছুই তার আগের অবস্থার ওপর বহাল থাকেনি।

যে জাতির শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা যেত, সে জাতিকেই তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে পুরো পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেন। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে নতুন নতুন শাখা আবিষ্কার করে। হিন্দুস্থান থেকে গ্রিস পর্যন্ত পুরো পৃথিবীর জ্ঞানভান্ডার একত্রিত করে এবং তা আরও উন্নত (develop) করে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করে।

তাহলে প্রথমে এ বিষয়টি প্রমাণিত হলো যে, পৃথিবীর সবচেয়ে সফল, সমৃদ্ধ ও অনেক গভীর চেতনা ধারণকারী (Most Profound) বিপ্লব ছিল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সংঘটিত বিপ্লব। অন্য কোনো বিপ্লবের সঙ্গে যার তুলনাই হয় না। কারণ, অন্য যত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, সব ছিল আংশিক বিপ্লব। এ ছাড়াও সেগুলোর খুঁটিনাটিতে গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখবেন, বিপ্লবের বীজ বপন করেছিল এক শ্রেণি আর বিপ্লব ঘটিয়েছে অন্য শ্রেণি। বিপ্লবের চিন্তা প্রসার করেছিল কিছু মানুষ আর বিপ্লব ঘটিয়েছিল অন্য কিছু মানুষ। কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস *Das Capital* রচনা করেছে জার্মানি ও ব্রিটেনে বসে; কিন্তু জার্মানি বা ব্রিটেনের কোনো একটি গ্রামেও মার্কসিস্ট বিপ্লব হয়নি। বরং তা রাশিয়ায় গিয়ে বলশেভিক ও ম্যানশেভিকদের হাতে হয়েছে। আর ঠিক তখনই ফ্রন্টে লেনিনের আবির্ভাব ঘটেছে। বিপ্লব সংঘটিত করার ক্ষেত্রে না কার্ল মার্কসের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে আর না এঙ্গেলসের।

বোঝা গেল, বিপ্লবের বীজ বুননকারী বা চিন্তা প্রসারণকারী ছিল এক শ্রেণি আর বিপ্লবের সংঘটক ছিল অন্য শ্রেণি। এমনিভাবে ভলতেয়ার (Voltaire) ও রুশোর (Jean-Jacques Rousseau) মতো আরও বহু লেখক ছিল, যারা স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের চিন্তা ও পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল। তারা ছিল শুধুই প্রবক্তা। তারা লেখালিখি করে জানান দিত চিন্তা ও পদ্ধতির; কিন্তু ময়দানে এসে নেতৃত্ব দিতে পারত না। এ কারণেই ফরাসি বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় সমাজের বদমাশ কিছু লোক। ফলে ফরাসি বিপ্লব প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী এক বিপ্লবে পরিণত হয়, যা নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো যোগ্য নেতৃত্ব ছিল না।

এবার আসুন, ভিন্ন এক দৃশ্য (contrast) দেখা যাক! রাসূল ﷺ-এর বিপ্লবই পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র বিপ্লব, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত

যার নেতৃত্বের বাগডোর একজনের হাতেই ছিল। একজন ব্যক্তিই এক সময় মক্কার পথে পথে ইসলামের প্রচারণা (Street Preaching) চালাচ্ছেন, অলিগলি বিচরণ করে দাওয়াত দিচ্ছেন, তাবলিগ করছেন। কেউ তাকে পাগল বলছে, কেউ উন্মাদ বলছে আবার কেউ কবি বলে ঠাট্টা করছে; তিনি সবকিছু সহ্য করে যাচ্ছেন। কখনও মুখ ফিরিয়েও দেখছেন না, কিছু বলা তো দূরের কথা! আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সেই একই ব্যক্তিই আবার বদর যুদ্ধে নেতৃত্বের বাগডোর হাতে মুসলিমবাহিনীকে পরিচালনা করছেন!

বলুন তো, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আর কারও নজির আছে? আমি আবারও ডা. মাইকেল এইচ. হার্টের সেই বাক্যটি উদ্ধৃত করব যে, He is the only, the only, the only person। কোথায় অলিগলি বিচরণ করে দাওয়াতি কাজ করা একজন দাঈ আর কোথায় সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া একজন সেনানায়ক! কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়? এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক একটি গুরুত্বপূর্ণ নোট দিয়ে রাখি আপনাদের। গত শতাব্দীর বিখ্যাত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আরনল্ড জে. টয়েনবি (Arnold J. Toynbee) রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে বিষাক্ত একটি মন্তব্য করেছে—

> Muhammad failed as a prophet, but succeeded as a statesman.
>
> অর্থাৎ, মুহাম্মাদ একজন নবি হিসেবে ব্যর্থ হয়েছেন; তবে একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে সফল হয়েছেন।

টয়েনবির এ মন্তব্যের ব্যাখ্যায় ব্রিটিশ প্রফেসর মন্টগমেরি ওয়াট (W. Montgomery Watt) দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন : *Muhammad at Mecca* ও *Muhammad at Madina*। দ্বিতীয় বই অর্থাৎ 'মুহাম্মাদ অ্যাট মাদিনা'-য় বাহ্যিকভাবে তিনি রাসূল ﷺ-এর জন্য প্রশংসাসূচক

যত বাক্য ব্যবহার করা যায়, দ্বিধা ছাড়া করে ফেলেছেন; কিন্তু এসব শব্দের আড়ালে তিনি একটি বৈপরীত্য দেখানোর চেষ্টা করেছেন—তা হচ্ছে, মক্কার মুহাম্মাদের চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা একরকম ছিল আর মদিনার মুহাম্মাদের সবকিছু অন্যরকম ছিল। অর্থাৎ দুজনের মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। রাসূল ﷺ-এর শানে মন্টগমেরির ব্যক্ত প্রশংসাবাক্যে প্রবঞ্চিত হয়ে মরহুম জিয়াউল হক তাকে বার্ষিক সিরাত কনফারেন্সে প্রধান আলোচক হিসেবে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তার ধারণাই ছিল না, মন্টগমেরি কোন কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে সিরাতুন নবিতে এই বৈপরীত্য দেখানোর চেষ্টা করেছেন—মক্কার মুহাম্মাদ আর মদিনার মুহাম্মাদ দুজন আলাদা আলাদা ব্যক্তি; তাদের চিন্তাধারাও সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আসলে এরা যখন রাসূল ﷺ-এর মক্কার জীবনধারা নিয়ে গবেষণা করে, তখন যদিও তারা তাকে নবি বা রাসূল মানে না; কিন্তু এটা অবশ্যই মানে যে, তাঁর জীবনধারা নবিদের জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে। যেমন, ঈসা আলাইহিস সালাম পথে পথে দাওয়াতের কাজে বিচরণ করে ফিরতেন, তেমনিভাবে মুহাম্মাদ ﷺ-কেও দাওয়াতি কাজে মক্কার অলিতে-গলিতে ঘুরতে দেখা গেছে। যেমন, ঈসা আলাইহিস সালামকে গালমন্দ করে যা কিছু বলা হয়েছে, তিনি সহ্য করে গেছেন; তেমনিভাবে মুহাম্মাদ ﷺ-ও সহ্য করেছেন, প্রতিউত্তরে কাউকে কিছু বলেননি। তো তাদের মতে, নবিদের সঙ্গে অনেক কিছুতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সামঞ্জস্য থাকলেও এক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থ সাব্যস্ত হয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ)। কারণ, প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাকে মক্কা থেকে পালাতে হয়েছে। তারা আসলে হিজরতকেই flight (পালানো) বলে অভিহিত করে; অথচ ফ্লাইট হয়ে থাকে ভয়ের কারণে। বিপরীতে হিজরতের পেছনে কোনো ভয়-ভীতি কাজ করেনি;

বরং তা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত দাওয়াতের কর্মপন্থারই (strategy) অংশ, যার উদ্দেশ্য ছিল—দাওয়াতের কাজকে বিস্তৃত করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও ক্ষেত্র তৈরি করা।

যাই হোক, প্রাচ্যবিদরা হিজরতের পর মদিনার সময়কালে বিলকুল একজন নতুন মুহাম্মাদ ﷺ-কে আবিষ্কার করেছে। যিনি একাধারে যুগের সবচেয়ে বড়ো রাজনীতিবিদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, একটি রাষ্ট্রের অধিকর্তা হিসেবে সামনে এসেছেন, একইসঙ্গে নিজেকে বাহিনীর নেতৃত্বদানকারী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তারা আরও দেখতে পেয়েছে, মদিনায় এসে তিনি স্থানীয় ইহুদিদের সঙ্গে চুক্তি করছেন। নিজের ব্যবস্থাপনা-যোগ্যতা, রাষ্ট্র পরিচালনা-দক্ষতা (Statesmanship) ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের অনন্যতা প্রদর্শন করছেন। তাদের কাছে এসব কিছু রাসূল ﷺ-এর পবিত্র জীবনের বৈপরীত্যপূর্ণ বিষয় মনে হয়েছে।

আপনাদের সামনে মন্টগমেরির বিষাক্ত কথাটির উদ্ধৃতি এটা বোঝার জন্য দিয়েছি যে, রাসূল ﷺ-এর জীবনীতে আসলেই বৈপরীত্যপূর্ণ বিষয় আছে। আর সেই বৈপরীত্যটা এদিক থেকে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই এমন একক ব্যক্তিত্ব, যিনি নিজেই বিপ্লবের সূচনা করেছেন, আবার নিজেই তা সফলতার শেষ মনজিল পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। ইতিহাসে আর কোনো বিপ্লব তার প্রবক্তার জীবদ্দশায় পূর্ণতা পায়নি; বরং বিপ্লবের চিন্তা যিনি প্রণয়ন করেছেন, তার লাশ পচে-গলে যাওয়ার পরে হয়তো কোথাও তার সেই চিন্তার ওপর ভিত্তি করে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। রাসূল ﷺ-এর বিপ্লব এদিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অতুলনীয় যে, তিনি নিজের জীবনের ২৩ বছরের মধ্যেই বিপ্লবের শুরু থেকে শেষ—সব ধাপ ও স্তর সফলভাবে পরিচালনা করেছেন।

অতএব, বর্তমান সময়ে কেউ যদি পূর্ণ একনিষ্ঠতার সাথে বিপ্লবের সঠিক রূপরেখা আত্মস্থ করতে চায়, তাহলে সে কেবল রাসূল ﷺ-এর সিরাতেই সামগ্রিকভাবে এর দিকনির্দেশনা পাবে। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন প্রমুখদের জীবনী থেকে মোটেও এর দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে না। তো, সহজ ভাষায় বলতে গেলে, সফল বিপ্লবের পথ ও পন্থা জানার জন্য বর্তমান পৃথিবীর সামনে কেবল একটি সোর্সই আছে, আর তা হচ্ছে—রাসূল ﷺ-এর পবিত্র সিরাত।

এর ওপর ভিত্তি করেই বলছি, ইসলামি বিপ্লবের যে রূপরেখা আমি আপনাদের সামনে পেশ করতে যাচ্ছি, এর জন্য আমার সোর্স হচ্ছে শুধুই রাসূল ﷺ-এর সিরাত। আমি ধর্মীয় পরিভাষা—দ্বীন, ইসলাম, ঈমান, জিহাদ প্রভৃতি ব্যবহার করা ছাড়াই আধুনিক যুগের পরিভাষা ব্যবহার করে আপনাদের সামনে বিপ্লবের ধাপ-পরিধাপগুলো তুলে ধরতে চাই। এর কারণ হচ্ছে, অধঃপতনের এ যুগে পরিভাষাগুলোর গূঢ় অর্থ হয়তো সংকীর্ণ—নির্দিষ্ট ঘরানাকেন্দ্রিক হয়ে গেছে, নয়তো একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন যখন আমরা কোনো পরিভাষা ব্যবহার করব, তখন উদ্দিষ্ট সেই অর্থগুলোই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে। তাই সেসব পরিভাষা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে যদি আধুনিক টার্মিনোলজি ব্যবহার করে আলোচনা করা যায়, তাহলে বিপ্লবের যে রূপরেখা আমি পেশ করতে যাচ্ছি—আপনাদের পক্ষে তা বোঝাটা তুলনামূলক অধিক সহজ হবে। আধুনিক টার্মিনোলজি ব্যবহার করে এই রূপরেখা উপস্থাপনের পর আমরা চেষ্টা করব তা কুরআন-হাদিসের পরিভাষা এবং রাসূল ﷺ-এর সিরাতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির সমন্বয়ে উপস্থাপন করতে।

❀❀❀

পূর্ণাঙ্গ ও সফল বিপ্লবের ধাপ-পরিধাপ

একটি পূর্ণাঙ্গ ও সফল বিপ্লব সাধনের জন্য অবশ্যপালনীয় ছয় থেকে সাতটির মতো ধাপ থাকে। এখানে ধারাবাহিকভাবে সেগুলো আমরা উল্লেখ করছি :

১. বিপ্লবী দর্শন

প্রতিটি বিপ্লবের জন্য প্রথম ধাপেই এমন একটি বিপ্লবী চিন্তাধারা বা দর্শনের প্রয়োজন, যা তার আগে থেকে চলে আসা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিস্টেম (Politico-Socio-Economic System)-কে একেবারে গোড়া থেকে উৎপাটিত করবে। এখন কোনো দর্শন বা চিন্তাধারা বিপ্লবী কি না, সেটা কীভাবে বুঝবেন? সে দর্শন বা চিন্তাধারা বিদ্যমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার গোড়ায় যতক্ষণ ঝাঁকুনি না দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ধরে নেবেন—তা কোনো বিপ্লবী দর্শন নয়; বরং তা শুধুই সাধারণ উপদেশমাত্র (Sermon)। এর বেশি কিছু নয়।

এখন সেই দর্শন বা চিন্তাধারা যদি নতুন হয়, তাহলে বিষয়টি কিছুটা সহজ। তারা নিজেদের পরিভাষা নিজেরাই তৈরি করবে এবং সেসব পরিভাষার অর্থও নিজেরা ঠিক করবে। কিন্তু যদি সেই দর্শন বা চিন্তাধারা পুরোনো হয়, তাহলে তার আধুনিকায়ন করতে হবে এবং

যুগোপযোগী নতুন পরিভাষা ব্যবহার করে তা জ্ঞানের পরিমণ্ডলে উপস্থাপন করতে হবে। তারপর সেই দর্শনের ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার ঘটাতে হবে। সর্বোপরি তার প্রসারে আধুনিক সব প্রচারমাধ্যমের সহযোগিতাও নিতে হবে। অতীতে একসময় শুধু বাজারের অলিতে-গলিতে ঘুরেফিরে লোকদের সমবেত করে তারপর তাদের সামনে কোনো কিছু উপস্থাপন করা যেত; কিন্তু এখন যুগ বদলে গেছে। এখন সভা-সমাবেশ হয়। লেখা হয় বই-পুস্তক।

এ পরিপ্রেক্ষিতেই বিপ্লবী চিন্তাধারা ও দর্শনের প্রসারে প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ আধুনিক যুগের যত প্রচারমাধ্যম আছে, সবকিছু ব্যবহার করতে হবে। সবকিছুকে কাজে লাগাতে হবে।

২. সংগঠন

দ্বিতীয় ধাপে সে দর্শন ও চিন্তাধারা যারা গ্রহণ করে নেবে, তাদের একটি সংগঠনের অধীনে একত্রিত করা হবে। সংগঠনের জন্যও দুটি শর্ত আছে :

প্রথমত, সংগঠনে লাগবে দৃঢ় নিয়মানুবর্তিতা ও মজবুত শৃঙ্খলা (discipline)। কারণ, যখন আপনারা আগে থেকে চলে আসা ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করতে ময়দানে নামবেন, তখন আগের ব্যবস্থার সুবিধাভোগীরা সেই ব্যবস্থার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে উলটো আপনাদের দমন করতে উঠেপড়ে লাগবে। ঠিক তখনই তাদের মোকাবিলায় আপনাদের একটি সামরিক ডিসিপ্লিনের প্রয়োজন হবে। শুধু আন্দোলনের কর্মীদের পক্ষে মোকাবিলা করে কুলিয়ে উঠা সম্ভব হবে না; বরং এখানে 'Listen and Obey'-এর মূলনীতি মানা—একটি সুবিন্যস্ত সুশৃঙ্খল বাহিনীর প্রয়োজন হবে। যাদের ডিসিপ্লিনের

অবস্থা হবে এমন, 'Theirs not to reason why? Theirs but to do and die!'—অর্থাৎ তারা (ইসলামি আন্দোলনের কর্মীরা) আদর্শবান নেতাদের নির্দেশের পেছনের কারণ খুঁজতে যাবে না; বরং নেতার নির্দেশ মানা এবং প্রাণ দেওয়াকেই নিজেদের নীতি বানাবে।

দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের প্রতি বিশ্বস্ততা ও ত্যাগ-কুরবানির ওপর ভিত্তি করে সাংগঠনিক পদমর্যাদা নির্ধারিত হবে। এই বিবেচনায় নয় যে, কেউ ব্রাহ্মণ হলে সে পদমর্যাদার অধিকারী হবে আর কেউ অচ্ছুত হলে সে পদমর্যাদার অধিকারী হবে না। যদি অবস্থা এমনই হয়, তাহলে এটা কোনো বিপ্লবী সংগঠন বলে গণ্য হবে না।

কারণ, একটি বিপ্লবী সংগঠনে তো সবার মর্যাদা নির্ধারিত হবে প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও আন্দোলনের প্রতি তার বিশ্বস্ততার ওপর ভিত্তি করে। এক্ষেত্রে শুধু এবং শুধুই কর্মী ও সদস্যদের ত্যাগ-কুরবানি দেখা হবে। আন্দোলনের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা মূল্যায়িত হবে। যার ভিত্তিতে একজন অচ্ছুত যেমন কোনো কমিউনিস্ট পার্টিতে পদমর্যাদায় অনেক ওপরে চলে যেতে পারবে, আবার একজন ব্রাহ্মণও নিচে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

৩. তারবিয়াত

তৃতীয় ধাপ হচ্ছে, কর্মীদের তারবিয়াত। এই ধাপে সংগঠনের কর্মীরা বিপ্লবের যে দর্শন লালন করে, নিজেদের মন ও মনন থেকে মুহূর্তের জন্যও তা বিস্মৃত হতে দেবে না। কারণ, এ দর্শনই তো বিপ্লবের জন্য চালিয়ে যাওয়া যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টার ভিত্তি। এই আদর্শ সার্বক্ষণিক মননে সমুজ্জ্বল থাকলেই কাজের জযবা ও উদ্দীপনা জাগ্রত থাকবে। আর যখনই তা ঝিমিয়ে পড়বে, কাজের আগ্রহও ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে।

একইসঙ্গে কর্মীদের 'শোনো ও মানো'—মূলনীতিতে অভ্যস্ত বানাতে হবে। এ কাজ খুব সহজ নয়; বরং এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির। কবির ভাষায়—

ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے

بے نیازی تری عادت ہی سہی

আমরাও নিজেদের সমর্পিত করার অভ্যাস গড়ে তুলব। হোক না—কারও প্রতি অমুখাপেক্ষিতা তোমার স্বভাবেরই অংশ।

কিন্তু মানার অভ্যাস তৈরি করা সহজ কোনো কাজ নয়। এতে আমিত্ব বাধ সাধে; বরং আমিত্ব থেকেও আগে বেড়ে অহংকার চলার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সফল বিপ্লবের জন্য তারবিয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আন্দোলনের কর্মীদের ভেতর জানমাল থেকে শুরু করে সবকিছু উৎসর্গ করার জযবা ও মানসিকতা তৈরি করা। এ ছাড়া বিপ্লব সংগঠিত করা সম্ভব নয়। আল্লামা ইকবালের ভাষায়—

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے ترا آئنہ ہے وہ آئنہ

کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہِ آئینہ ساز میں!

এত যত্ন করে রেখো না, এ তো তোমার আয়নাই, অন্য কিছু নয়। তাও আবার এমন আয়না—ভেঙে গেলে পরে আয়নার কারিগরই সবচেয়ে বেশি খুশি হয়।

জানমাল উৎসর্গ করার জযবা ও মানসিকতা—এটি বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। এ ছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে বিপ্লবের মাধ্যমে আপনারা যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চান—তাতে

যদি আত্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতার দিকটিও সবিশেষ লক্ষণীয় হয়, তাহলে কর্মীদের আধ্যাত্মিক তারবিয়াতও দিতে হবে। কারণ, কর্মীদের মধ্যেই যদি আধ্যাত্মিকতা না থাকে, তবে বিপ্লবের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও পরিশুদ্ধতা কোত্থেকে আসবে?

৪. সবর (Passive Resistance)

এই ধাপটি বলার ক্ষেত্রে তো চার নম্বরে আসে; কিন্তু বাস্তবে এর সূচনা প্রথম ধাপের সঙ্গেই হয়ে যায়। সবর বা ধৈর্যের অর্থ হচ্ছে—সংগঠনের কর্মীরা নিজেদের অবস্থানের ওপর অবিচল থাকবে, কোনো অবস্থাতেই পিছু হটবে না। বিশেষ করে, যখন কঠোরতা ও নির্যাতনের খড়গ নেমে আসবে, তখন সবরের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে; কোনো প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

এর পেছনের কারণ ও উদ্দেশ্য যৌক্তিক (logical)। প্রথম কথা হচ্ছে, সমাজে বিরোধ (conflict) সৃষ্টিকারী হচ্ছে এই বিপ্লবীরা; নতুবা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা তো স্বাভাবিকই ছিল। ধনী-গরিব সবার উপস্থিতি ছিল। গরিবরা তাদের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিল। ধনীরা আরাম-আয়েশে মজে ছিল আর গরিবরা নিজেদের জীবনযাত্রা সচল রাখার মেহনতে ব্যস্ত ছিল। তারা সবকিছুকে নিজেদের 'তাকদির' মনে করত আর বলত, আল্লাহই তো আমাদের গরিব বানিয়েছেন! এ জন্যই হয়তো মার্কস বলেছিল, 'ধর্ম হচ্ছে জনসাধারণের জন্য আফিম'। ধর্মীয় অনুভূতি থেকেই মূলত তারা নিজেদের অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট থাকে; বিপ্লবের কথা চিন্তায়ও আনে না। শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা ভাবা তো দূরের কথা!

বিষয়টি বোঝার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন ধরুন, একটি শান্ত-তরঙ্গহীন পুকুরে আপনি পাথর নিক্ষেপ করলেন;

এতে কী হবে? পুকুরের পানিতে সৃষ্টি হবে কম্পন। ঠিক একইভাবে ইসলামি বিপ্লবের স্বপ্নচারীরাও আগে থেকে চলে আসা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। এই প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার মধ্যে যে গলদ আছে, এটা তারা কোনোরকম রাখঢাক ছাড়াই প্রকাশ্যে বলতে শুরু করে। শাসনব্যবস্থা যে শোষণমূলক (exploitative), সাধারণ মানুষ এটা তাদের মুখেই শুনতে পায়। তো বলা যায়, বিপ্লবের স্বপ্নচারী ইসলামি আন্দোলনের এই কর্মীরাই মূলত জনসাধারণের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিভক্তি (discrimination) তৈরি করে। তারাই জনগণের একটি অংশকে প্রতিষ্ঠিত কায়েমি শক্তির বিরুদ্ধে নিয়ে যায়।

তাহলে আগের কথাগুলো বুঝে থাকলে এবার বলুন, পাথর কারা মেরেছে? বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীরা! এখন পাথর যখন পুকুরে পড়বে, তরঙ্গ তো হবেই। তো সমাজে যে তরঙ্গ তৈরি হয়, এ তো বিপ্লবের দিকে দাওয়াতের স্বভাবজাত প্রতিক্রিয়া। তবে হ্যাঁ, এই প্রতিক্রিয়ার রিঅ্যাকশনেরও কিন্তু বিভিন্ন পর্যায় (stages) হয়ে থাকে। তন্মধ্যে দুটি পর্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম পর্যায়ে কায়েমি স্বার্থবাদী শক্তি বিপ্লবের দিকে আহ্বানকারীর অর্থাৎ দাঈর কর্মকাণ্ডকে বিতর্কিত করার এবং কোনো না কোনোভাবে তার ব্যক্তিত্বকে কলুষিত করার চেষ্টা করে। তার মনোবল ভেঙে দেওয়ার এবং ইচ্ছাশক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র করে; তাই এই পর্যায়ে শুধু দাঈকেই কঠোরতা, আক্রমণ ও নিপীড়নের (persecution) শিকার হতে হয়। কায়েমি শক্তি প্রথমে তাকে শক্তিপ্রয়োগ ছাড়া মৌখিকভাবে এই বলে আক্রমণ করে যে, 'আরে! এ তো পাগল, অপ্রকৃতিস্থ। তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে; তাই আমাদের চলমান ব্যবস্থার ওপর আপত্তি করছে। আমাদের এই শাসন বা সমাজব্যবস্থা শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে চলে আসছে।

আমাদের বাপদাদারাও এই ব্যবস্থার প্রতিই অনুগত ছিল। আর এই পাগল কিনা সেই ব্যবস্থাকেই গলদ বলছে! নিশ্চয় একে কোনো জিন-ভূতে ধরেছে।'

বাস্তবিকপক্ষে এটা তাদের একটা কূটকৌশল। যার আশ্রয় নিয়ে তারা দাঈর ইচ্ছাশক্তি নিঃশেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। কারণ, একজন দাঈর যদি ইচ্ছাশক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তাকে দিয়ে যে ময়দানে আর কোনো কাজ হবে না—এটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। একটি বৃক্ষের শিকড়ই যখন কেটে দেওয়া হয়, তখন পুরো বৃক্ষ তো এমনিতেই ছিন্নমূল হয়ে যায়।

কিন্তু এই পর্যায়ে দাঈ যদি অটুট মনোবলে সব প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে যান, নিজের ওপর আরোপিত সব আপত্তি ও অপবাদ সহ্য করে যান, কোনো ধরনের প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ না নেন আর একইসঙ্গে বিরোধীরাও প্রত্যক্ষ করে যে, এই দাওয়াত তো দিন দিন জনপ্রিয়তা লাভ করছে, প্রসারিত হচ্ছে; তখন শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের রিঅ্যাকশন। অর্থাৎ, তারা আগের অবস্থা থেকে অগ্রসর হয়ে এবার দাঈদের শারীরিকভাবেও নির্যাতন-নিপীড়নের নিশানা বানায়। এই দফায় কিন্তু তাদের শিকার শুধু আন্দোলনের আহ্বায়করাই হন না; বরং আন্দোলনের সব সদস্য, কর্মী ও সমর্থনকারীরাও হন। বিশেষ করে, নিম্নবিত্ত দুর্বল জনসাধারণ এবং উচ্চবিত্ত ঘরানার যুবকরা তাদের শিকারে পরিণত হয়। আন্দোলনের জনশক্তিদের ধরে ধরে মারধর করা হয়, ক্ষুধার্ত রাখা হয়, ঘর থেকে উচ্ছেদ করা হয়, কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, হত্যা করা হয়; এমনকি ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে হাজারো কর্মীদের শহিদ পর্যন্ত করে দেওয়া হয়।

এখানে ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের শুধুই ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে। যত কঠোরতা আর নিপীড়নই চলুক-না কেন, কোনো ধরনের প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়াই শুধু সহ্য করে যেতে হবে। কেন কোনো ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে না? কারণ, প্রথমদিকে আন্দোলনের জনশক্তি কিন্তু সংখ্যায় একেবারে নগণ্য হয়। এ কমসংখ্যক কর্মী যদি উত্তেজিত হয়ে প্রতিরোধমূলক কোনো পদক্ষেপ নিতে যায়, তাহলে কায়েমি শক্তি তাদের পিষে ফেলার অধিকার লাভ করবে। যদি তারা কোনো প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়াই চুপচাপ সবকিছু সহ্য করে যায়, তবে তারা অনেক জুলুমের শিকার হবে ঠিক, কিন্তু একেবারে ছিন্নমূল হবে না। কায়েমি শক্তি তাদের নিঃশেষ করে দিতে পারবে না। এর ফলে তারা দাওয়াতি কাজ প্রসারিত করার এবং সংগঠনের সদস্য ও কর্মীসংখ্যা বাড়ানোর মতো সময়-সুযোগ দুটোই লাভ করবে।

মনে রাখতে হবে, বিপ্লবের স্বপ্নদ্রষ্টা একটি ইসলামি সংগঠনের কর্মীরা কায়েমি শক্তির সঙ্গে তখনই সরাসরি টক্কর দিতে পারবে, যখন তারা শক্তিশালী হয়ে যাবে। আর শক্তি অর্জনের জন্য তাদের সময়ের প্রয়োজন। যাকে আমি 'to buy time' বলে থাকি। এই সময়টিতে কর্মীরা নিজেদের সুরক্ষার জন্যও প্রতিপক্ষের ওপর হাত উঠাবে না, কোনো ধরনের কঠোর পদক্ষেপ নিতে যাবে না। এতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ফল বের হয়ে আসবে তা হচ্ছে, আন্দোলনের কর্মীরা জনসাধারণের সহমর্মিতা লাভ করতে সক্ষম হবে। আর সাধারণ মানুষ তাদের আপদ হিসেবে দেখবে না।

দেখুন, একটি সমাজে চৌধুরী, সরদার, বিত্তশালী ও জমিদারদের উপস্থিতি যেমন আছে; জনসাধারণেরও কিন্তু সমান উপস্থিতি থাকে। চৌধুরী, সরদার, বিত্তশালী আর জমিদার শ্রেণি তো বুঝতে পারছে,

এই আন্দোলন তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। বিপরীতে জনসাধারণ এমন কিছু মনে করছে না; কিন্তু এটাও ঠিক যে, ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর সাহসও তারা করে উঠতে পারছে না। একইভাবে তাদের পক্ষেও কিছু বলতে পারছে না। একে আমরা 'নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠতা' (Silent Majority) বলে থাকি।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ চুপ থাকে ঠিক, কিন্তু তারা তো আর অন্ধ-বধির নয়, তাই না? সমাজে কী ঘটছে, তারা সবকিছুই দেখছে। বিপ্লবের পক্ষে স্লোগান তোলা ব্যক্তিদের কেন মারা হচ্ছে, কেন গুম করা হচ্ছে, কেন হত্যা করা হচ্ছে, কেন তাদের ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত করা হচ্ছে, কেন তাদের পরিবারের সদস্যদের রক্তে রঞ্জিত হতে হচ্ছে—এ সবকিছু নিয়েই তারা ভাবে। তারা ভাবে, আসলে এদের অপরাধটা কী? এরা কি চুরি করেছে নাকি ডাকাতি? কিছুই তো করেনি। এরা শুধু একটি আদর্শের প্রতি বিশ্বাস রাখে, একটি দর্শন লালন করে আর সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার, দমন-পীড়ন ও শোষণ-তোষণের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চায়। ধীরে ধীরে এ সবকিছু সাধারণ মানুষের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করতে থাকে। তারা ভাবতে শুরু করে, আসলেই তো এদের ওপর জুলুম হচ্ছে, অন্যায় হচ্ছে, অবিচার হচ্ছে। এসব ভাবনা থেকেই মূলত বিপ্লবের ধারক-বাহক ও প্রচারকদের জন্য সাধারণ মানুষ অন্তরের সহমর্মিতা ও ভালোবাসার অর্গল খুলে দেয়, যা সময়ের ব্যবধানে ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গী হয়ে যায়। আর কবি তো বলেছেনই—

জনগণের অন্তর যারা জয় করে নিতে পেরেছে,

তারাই যুগের আসল বিজেতা!

৫. সক্রিয় প্রতিরোধ (Active Resistance)

বিপ্লবের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতার পঞ্চম ধাপটি হচ্ছে, 'সক্রিয় প্রতিরোধ'। এটি ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের জন্য খুবই নাজুক একটি বিষয়। আর যারা নেতৃবৃন্দ আছেন, তাদের জন্য মেধা ও যোগ্যতা পরীক্ষার ব্যাপার। এই ধাপটির জন্য সঠিক সময় বাছাই করতে পারা খুবই জরুরি। যদি প্রস্তুতি ছাড়াই আপনারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে যান, তাহলে আপনাদের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাবে। অন্যদিকে প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পরও যদি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেরি হয়, তাহলে সুযোগ হারাবেন।

তাহলে বোঝা গেল, যদি আপনি সুযোগ হারান, তাহলেও ব্যর্থ হবেন। আবার যদি সঠিক সময়ের আগেই পদক্ষেপ নিয়ে বসেন, তাহলেও ব্যর্থ হবেন। মূলত, প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত তখনই নিতে হবে, যখন ইসলামি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অনুভব করবেন যে, এখন আমাদের প্রস্তুতি যথেষ্ট! এই 'যথেষ্ট'-এর রূপ একেক অবস্থায় একেক রকম হবে। যেমন দেখুন, ছোটো একটি দেশ—যার জনসংখ্যা সর্বোচ্চ কোটির মতো, সেখানে ইসলামি বিপ্লবের জন্য ৫০ হাজার লোক প্রস্তুত থাকলে সেটাই 'যথেষ্ট' বলে সাব্যস্ত হবে। বিপরীতে ১৫ কোটি জনসংখ্যার দেশে ৩-৪ লক্ষের মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন হতে পারে।

এরপরের কথা হচ্ছে, শুধু এ সংখ্যক কর্মী প্রস্তুত হলেই হবে না; তাদের ডিসিপ্লিনের অনুগামী বানাতে হবে। 'Listen and Obey' মূলনীতির কাছে নিজেদের ইচ্ছাকে বিলীন করা শেখাতে হবে; যাতে যখনই তাদের প্রতি ওপর থেকে নির্দেশ আসবে, সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে যাবে। আর যখন থামতে বলা হবে, কোনোরকম আগপিছ না

ভেবেই থেমে যাবে। তাদের অবস্থা এমন হলে চলবে না যে, প্রথমে তো নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য কাজেই নামতে চাইবে না আর যখন নেমে পড়বে, আর থামার নাম নেবে না।

মালাকুন্ডে সুফি মুহাম্মাদ সাহেবের[৪] নেতৃত্বে যে 'তাহরিকে নাফাজে শরিয়তে মুহাম্মাদি' বা ইসলামি শরিয়ত প্রতিষ্ঠা আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাতে আমির (নেতৃত্বদানকারী) নির্দেশই দেননি; কিন্তু কর্মীরা মাঠে নেমে পড়েছে। এরপর কী হয়েছিল? কুলিয়ে উঠতে না পেরে কর্মীরা পাহাড়ে মোর্চা বানিয়ে অবস্থান নিয়েছিল। আমির যখন তাদের নিচে নেমে আসার নির্দেশ দেন, তখন তারা বলতে শুরু করে—'মৌলভি কায়েমি শক্তির কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে'। এ থেকে বোঝা যায়, এটি সুশৃঙ্খল কোনো সংগঠন ছিল না। কর্মীদের মধ্যে ছিল না ডিসিপ্লিন; বরং এটি একটি আকস্মিক উত্থান বা জনসমাগম মাত্র—যার মূল চালিকাশক্তি ছিল মানুষের জযবা।

---

৪. **মাওলানা সুফি মুহাম্মাদ :** পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ ইসলামি আন্দোলন 'মালাকুন্ড ডিভিশন'-এর আমির এবং 'তাহরিকে নাফাজে শরিয়তে মুহাম্মাদি'-এর প্রতিষ্ঠাতা। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার আগে তিনি জামায়াতে ইসলামি পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। ২০০১ সালে আমেরিকা আফগানে হামলা করে, তিনি তখন প্রায় ১০ হাজার সঙ্গীসহ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কাবুলের পতন হলে তিনি পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং বন্দি হন। এরপর ২০০৮ সালে তাঁর জামাতা মাওলানা ফজলুল্লাহর হাত ধরে আবারও শরিয়ত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়। তা শান্ত করার জন্য পাকিস্তান সরকার সুফি মুহাম্মাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে তাকে মুক্তি দেয় এবং তাঁর দাবি মেনে ইসলামি আদালতও পুনরায় চালু করে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পরিস্থিতি আবারও ঘোলাটে হয়ে যায়। এর ফলে ২০০৯ সালে সুফি মুহাম্মাদকে আবারও বন্দি করা হয়। সর্বশেষ ২০১৮ সালে অসুস্থতাজনিত কারণে পেশাওয়ার হাইকোর্ট তাকে জামিন দেয়। ২০১৯ সালের ১১ জুলাই তিনি পেশাওয়ারে ইন্তেকাল করেন।—অনুবাদক

এই ধাপের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, লক্ষ্য বাস্তবায়নে আন্দোলনের কর্মীরা নিজেদের জানমাল থেকে শুরু করে সবকিছু কুরবানি করার জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে। মনে রাখবেন, যখন উপরোল্লেখিত বিষয়গুলো ষোলোকলায় পূর্ণতা পাবে, কেবল তখনই এই আন্দোলন ধৈর্যধারণের (Passive Resistance) ধাপ থেকে সক্রিয় প্রতিরোধের (Active Resistance) ধাপে উন্নীত হতে পারবে; এর আগে? প্রশ্নই আসে না!

এবার আসুন, সক্রিয় প্রতিরোধ (Active Resistance)-এর ব্যাপারে ধারণাকে আরও সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করি। এর জন্যও আমি বাইরের উদাহরণ দেবো; আপাতত রাসূল ﷺ-এর সিরাত থেকে কোনো উদাহরণ দেবো না। কারণ, আগেই বলেছি—প্রথমে আপনাদের সামনে আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করে একটি খসড়া আলোচনা পেশ করব। তারপর সেই আলোচনাটি সিরাতুন নবি ﷺ-এর রঙে সাজিয়ে দেবো। তবে, পাশাপাশি আপনাদের এটাও মনে রাখতে হবে, আমার মতে—সফল বিপ্লবের রূপরেখা জানার ও বোঝার জন্য সিরাতুন নবি ﷺ ছাড়া বিকল্প কোনো মাধ্যম নেই এবং তা হতেই পারে না।

সক্রিয় প্রতিরোধ (Active Resistance) হচ্ছে, আপনি কায়েমি শক্তিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানানো ছাড়া চলমান ব্যবস্থার কোনো পীড়িত রগকে অচল করে দিন। যেমন দেখুন, গান্ধি ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথমে 'বাড়াবাড়ি করব না, সাহায্যও করব না' স্লোগান তুলেছিলেন। অর্থাৎ, আমরা বাড়াবাড়ি করব না, হাতাহাতিতে যাব না। আবার আমরা ব্রিটেনের কলকারখানায় বানানো কাপড়ও ব্যবহার করব না; বরং নিজেদের চরকায় সুতো কাটব এবং সেই সুতোর

পোশাকই বানিয়ে পরব। চরকাকে তারা নিজেদের 'জাতীয় নিদর্শন' বানিয়ে ফেলল। একটু খেয়াল করে তো দেখুন! এই আধুনিক বিংশ শতাব্দীতে একটি জাতি নিজেদের জাতীয় নিদর্শন বানিয়েছে চরকাকে!

বিষয়টি বুঝে থাকলে এবার বলুন, তারা কি ব্রিটিশ প্রশাসনের দিকে সরাসরি কোনো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে কিংবা তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে তাদের কোনো ক্ষতি করেছে? তারা কারও জানমালের কোনো ক্ষতি করেনি, তারপরও প্রশাসনের মধ্যে ভয়ংকর কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেছে। কারণ, ভারতীয়দের এমন সিদ্ধান্তে ম্যানচেস্টারের কারখানাগুলোতে উৎপাদন বন্ধ হতে শুরু করে। তদানীন্তন সময়ে ভারতে ইংরেজদের উৎপাদিত কাপড়ের অনেক বড়ো বাজার ছিল। ব্রিটেন থেকে আসা গরম কাপড় ও মলমলের চাহিদা ছিল প্রচুর; কিন্তু গান্ধির বয়কট আন্দোলনের পর সেখানে শুধু খাদি কাপড়ই[৫] বিক্রি হতে শুরু করল।

এটি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ (Active Resistance)-এর প্রথম পদক্ষেপ। এর দ্বারা ইংরেজরা বুঝে গিয়েছিল, এবার কিছু একটা হতে যাচ্ছে। ইংরেজবিরোধী এই আন্দোলনের দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল—'আমরা বাড়াবাড়ি করব না, মারামারি করব না; কিন্তু ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত নিয়মও ভাঙব; সেই নিয়ম মানব না'। এর উদাহরণ দেখুন, পরমাত্মা সমুদ্র লবণ উৎপাদন করত। ভারতীয়রা সিদ্ধান্ত নেয়, তারা পরমাত্মা সমুদ্র থেকে লবণ আহরণ করবে। এতে কিন্তু তারা কারও সঙ্গে বাড়াবাড়ি করছে না ঠিক; কিন্তু পরোক্ষভাবে ইংরেজ সরকারের প্রতিষ্ঠিত 'করনীতি'-কে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কারণ, তদানীন্তন সময়ে লবণের ওপর ইংরেজরা অনির্দিষ্ট কর আরোপ করে রেখেছিল। ভারতীয়দের এই পদক্ষেপের

---

৫. দেশে তৈরি একধরনের মোটা কাপড়।

ফল হয়, তাদের পিঠের ওপর লাঠির আঘাত পড়ে। বড়ো বড়ো নেতাদের মাথা ফাটে। অনেককে কারাবন্দি করা হয়; কিন্তু আজাদি আন্দোলনের কর্মীরা কোনো বাড়াবাড়ির আশ্রয় নেয়নি। কোনো ধরনের প্রতিরোধেও জড়ায়নি। কারও জানমালের ক্ষতিও করেনি।

৬. চূড়ান্ত পদক্ষেপ

সক্রিয় প্রতিরোধের পর ষষ্ঠ ও শেষ ধাপ হচ্ছে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ। অর্থাৎ, বর্তমান কায়েমি শক্তি ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে ইসলামি আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মীরা চূড়ান্ত দফারফায় যাবে। কারণ, যখনই আপনি সক্রিয় প্রতিরোধ শুরু করবেন, তখনই পরিস্থিতি এমন হবে—যেন আপনি পুরো প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপকদের চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ক্ষমতায় থাকা স্বৈরাচারী শক্তি ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের পুরোপুরিভাবে মূলোৎপাটন করতে উঠেপড়ে লাগবে। ঠিক তখনই কিন্তু ইসলামি আন্দোলন এবং ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের আসল পরীক্ষা শুরু হবে। যদি সাংগঠনিকভাবে বিপ্লবের জন্য ঠিকঠাক প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে থাকে, সদস্য ও কর্মীদের তারবিয়াত প্রত্যাশিত মানের হয়ে থাকে, সঠিক সময়ে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়ে থাকে, তাহলে এই আন্দোলন সফলতার মুখ দেখবে। জালিমরা গদি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে। বিপরীতে যদি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি ছাড়াই প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়, কর্মীদের সংখ্যা 'যথেষ্ট'-এর কোঠায় পৌঁছা ছাড়াই চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়, কর্মীদের যথাযথ তারবিয়াত আর Listen and Obey-এর কাছে পুরোপুরি সোপর্দ করার মানসিকতা তৈরি হওয়ার আগেই ময়দানে নামিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এর অনিবার্য পরিণতি যা হবে—তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তখন এই আন্দোলন খুব বাজেভাবে ব্যর্থ হবে!

তাহলে বোঝা গেল, চূড়ান্ত পদক্ষেপের যে ধাপ রয়েছে, এই ধাপ সম্পন্ন হলে সরাসরি ক্ষমতার আলাপ হবে। এই চূড়ান্ত পদক্ষেপের কয়েকটি ধরন হতে পারে—যা আমি পরে আলোচনা করব।

বিপ্লবের কার্যকর রূপরেখা পেশ করতে গিয়ে এ যাবৎ আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি, তা যদি আপনি কাব্যাকারে বুঝতে চান, তবে আল্লামা ইকবালের একটি ফারসি কবিতার কিছু চরণ থেকে বুঝে নিতে পারেন—

گفتند جہانِ ما آیا بہ تو می سازد؟ -

گفتم کہ نمی سازد، گفتند کہ برہم زن!

এই চরণটিতে ইকবাল নিজের একটি কথোপকথন পেশ করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ আমার কাছে জিজ্ঞেস করেন, 'ইকবাল, তোমাকে আমি যে পৃথিবীতে পাঠিয়েছি, তুমি নিজেকে তাতে মানিয়ে নিতে পেরেছ? পছন্দ হয়েছে তোমার?' উত্তরে আমি বললাম, 'না, আমার পছন্দ হয়নি। কারণ, এখানে জুলুমের জয়জয়কার। গরিবরা নিষ্পেষিত হচ্ছে। এখানে মজদুরদের লাল রক্ত থেকে শরাব নিংড়িয়ে পুঁজিবাদীরা তা পান করে।'

خواجہ از خونِ رگِ مزدور سازد لعلِ ناب

از جفائے دہ خدایاں کشتِ دہقاناں خراب

انقلاب! انقلاب! اے انقلاب!

পুঁজিবাদীরা মজদুরদের রক্ত থেকে শরাব নিংড়ায়। জমিদার জুলুমের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত করে চাষির খেতখামার নষ্ট করে। তার বাচ্চা ভুখা-নাঙ্গা পড়ে থাকে। খেতখামার থেকে অন্নের জোগান হয় না।

ইকবালের মাহাত্ম্যপূর্ণ কবিতাসমূহের মধ্যে এটিও একটি। যার মধ্যে তিনি ইনকিলাবের স্লোগান তুলেছেন। তো, এরপরের অবস্থা বর্ণনা করে ইকবাল বলছেন, 'যখন আমি বললাম, তোমার এই পৃথিবী আমার পছন্দ হয়নি প্রভু! এটা আমার জন্য বসবাসযোগ্য নয়!' তখন আল্লাহ বললেন, 'বারহাম জন!' অর্থাৎ 'একে দুমড়ে-মুচড়ে দাও। বিধ্বস্ত করে দাও। ইনকিলাব ছড়িয়ে দাও! বিপ্লব ঘটিয়ে দাও!'

এখন এই বিপ্লবের পন্থা ও ধাপ কী হবে? ইকবাল দুটি চরণে তা-ও বলে দিয়েছেন। প্রথম চরণে চারটি আর দ্বিতীয় চরণে দুটি ধাপ—

با نشۂ درویشی در ساز و دمادم زن -

چوں پختہ شوی خود را بر سلطنتِ جم زن!

অর্থাৎ, প্রথমে দরবেশি-জীবন ধারণ করো। নিজের কাজে মগ্ন থাকো। দাওয়াত-তাবলিগে ব্যস্ত থাকো। কেউ পাগল বলুক বা গালি দিক—প্রতিউত্তরে শুধু দুআ করে দাও। এটাই দরবেশি-জীবন। গৌতম বুদ্ধ যেমনটা করেছিলেন। প্রহার করা হচ্ছে, তা-ও কোনো প্রতিক্রিয়া আসছে না। এরপর যখন প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে—সংখ্যা যথেষ্ট হয়ে যাবে, তারবিয়াত-প্রশিক্ষণ যথার্থ মান নিশ্চিত করবে, কর্মীরা পুরোপুরি প্রত্যাশিত পর্যায়ে ডিসিপ্লিনের অনুগামী হবে এবং নিজেদের জানমাল সহ সবকিছু কুরবান করার মানসিকতা তৈরি হয়ে যাবে, তাহলে এবার তোমরা 'সালতানাতে জম' অর্থাৎ ফ্যাসিবাদী শক্তি, নিপীড়ক শাসক প্রভৃতির বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘর্ষে যাও, লড়াই করো। এই লড়াই ছাড়া কিন্তু কখনও বিপ্লব আসবে না। শুধু ওয়াজ করে বিপ্লব হয় না। জানের কুরবানি পেশ করতে হবে, রক্তের বিনিয়োগ করতে হবে। মনে রাখবেন, ঠান্ডা ঠান্ডা কাজে আর যাই হোক—কখনও বিপ্লব সংঘটিত হয় না, হবে না।

ওপরে ছয় ধাপে আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি, এগুলো হচ্ছে কোনো রাষ্ট্রে সামগ্রিকভাবে বিপ্লব সংঘটিত করার কার্যকর নীতি; জালিমদের তখত উলটিয়ে দেওয়ার মূলমন্ত্র। পরিপূর্ণভাবে এগুলোর অনুসরণ ছাড়া কস্মিনকালেও ইনকিলাব আসবে না, বিপ্লব সংঘটিত করা যাবে না। ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

৭. তাসদিরে ইনকিলাব (Export of Revolution)

উল্লিখিত ছয়টি ধাপ ছাড়াও বিপ্লবের আরও একটি ধাপ রয়েছে। একটি প্রকৃত ও সফল বিপ্লবের জন্য এই ধাপটিও পরীক্ষার মতো। কারণ, একটি প্রকৃত বিপ্লব কখনও কোনো ভৌগোলিক, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বিপ্লবের দর্শন যদি মজবুত, শক্তিশালী, যৌক্তিক ও দালিলিক হয়, তাহলে তা মানুষের মন-মনন ও চিন্তাভাবনায় ছেয়ে যায়। এ কারণেই মূলত একটি প্রকৃত বিপ্লব নির্দিষ্ট কোনো গণ্ডিবদ্ধ থাকে না; অবশ্যই তার প্রসার হয়। চারদিকে তা ছড়িয়ে পড়ে, যাকে আমরা Export of Revolution বলতে পারি।

সফল বিপ্লবের সপ্তম এই ধাপটি আমি রাসূল ﷺ-এর সিরাত থেকে আহরণ করেছি। অবশ্য একেও আমি ধর্মীয় পরিভাষা বাদ দিয়ে আধুনিক পরিভাষার মোড়কেই উপস্থাপন করছি। এখন আসুন, এই ধাপটিকে রাসূল ﷺ-এর সিরাতের রং এবং তাঁর ইনকিলাবের ঢঙে সাজিয়ে উপস্থাপন করি।

❀❀❀

রাসূল ﷺ-এর বিপ্লবী দর্শন ও তার দাবি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিপ্লবী দর্শন বলতে আসলে কী বোঝায়? এক শব্দে বলতে গেলে 'তাওহিদ', যার ব্যাপারে ইকবাল বলেছেন—

زندہ قوّت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی-

آج کیا ہے، فقط اک مسئلۂ علم کلام

কখনও এই তাওহিদ ছিল জীবন্ত শক্তি,

কিন্তু আজ তা হয়ে গেছে শুধু দর্শনের রক্তি।

অর্থাৎ, কখনও এ তাওহিদ রাষ্ট্র ও সমাজের বিপ্লবী দর্শন ছিল, কিন্তু কালের নিষ্ঠুর পালাবদলে আজ তা শুধু একটি ধর্মীয় বিতর্কের বিষয় হয়ে গেছে।

এখন আমরা এই বিপ্লবী দর্শন তথা তাওহিদের দাবি ও ফলাফলের ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করব।

১. খিলাফত

আগেই বলেছি, বিপ্লবী দর্শন ও চিন্তাধারার প্রথম বৈশিষ্ট্য হবে এমন যে, তা আগে থেকে চলে আসা ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে ছাড়বে। তাওহিদের দর্শনের অন্যতম দাবি হচ্ছে—'তাওহিদুল হাকিমিয়্যাহ'।

অর্থাৎ আল্লাহর জমিনে না কোনো মানুষ বা জাতির শাসন চলবে, আর না কোনো মানবরচিত আইনের শাসন চলবে। কারণ, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ—'জমিনের শাসন একমাত্র আল্লাহরই'।[৬]

سروَری زیبا فقط اُس ذاتِ بے ہمتا کو ہے-

حکمراں ہے اک وہی، باقی بتانِ آزری!

পরিচালনা ও নেতৃত্বের গুণ সেই মহান সত্তারই শোভা পায়, শাসক তো তিনি একজনই, বাকি সব আজরের গড়া বুত ছাড়া কিছু নয়।

তাওহিদের দর্শন মানবশাসনের যত ধরন বা প্রকার হতে পারে, সবকিছুকে অস্বীকার করে। না ব্যক্তিপর্যায়ের শাসন অর্থাৎ বাদশাহিকে স্বীকার করে, আর না কোনো জাতির অন্য জাতির ওপর শাসনকে স্বীকার করে, যেমন—ইংরেজরা আমাদের ওপর শাসনের ছড়ি ঘুরিয়েছিল। এমনিভাবে 'তাওহিদুল হাকিমিয়্যাহ'-এর কাছে গণতন্ত্র বা জনশাসনেরও কোনো ভিত্তি নেই। হাকিমিয়্যাহ বা সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)-এর মালিক শুধু আল্লাহই। শাসনের অধিকারও কেবল তাঁরই। মানবজাতির জন্য হচ্ছে 'খিলাফত'। অর্থাৎ, মানবজাতি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে কেবল প্রতিনিধি হবে, আল্লাহপ্রদত্ত বিধানের অনুগামী হবে; স্বতন্ত্র কোনো বিধানপ্রণেতা নয়।

হাকিমিয়্যাহ তথা সার্বভৌমত্বের অন্য সব ধরন শিরকের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান যুগের প্রচলিত গণতন্ত্রের শাসনের (Popular Sovereignty)

---

৬. সূরা আনআম : ৫৭, সূরা ইউসুফ : ৪০, ৬৭

কথা তো বলাই বাহুল্য। 'বিধানদাতা কেবল আল্লাহই আর রাসূল তাঁর প্রতিনিধি'। বলুন তো, এরচেয়ে তেজস্বী আর কোনো বিপ্লবী স্লোগান হতে পারে?

২. আমানত

তাওহিদের দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে, 'সবকিছুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ'। এই বিপ্লবী স্লোগান প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার শিকড়ে ধ্বংসাত্মক এসিডের মতো কাজ করে। 'কোনো ব্যক্তিই কোনো কিছুর মালিক নয়—না ব্যক্তিগতভাবে আর না জাতিগতভাবে!'। এই দর্শনটির মাধ্যমে পুঁজিবাদের অস্তিত্বই বাতিল হয়ে যায়; সঙ্গে কমিউনিজমের অস্তিত্বও। 'মালিক কেবল আল্লাহই'। لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ—'আকাশসমূহ ও ভূমিতে যা কিছু আছে, সবকিছু তাঁরই মালিকানাধীন'। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর মালিক তিনিই আর মানুষের কাছে যা কিছু আছে, সবকিছু 'আমানত'।

ایں امانت چند روزہ نزد ما ست –
درحقیقت مالک ہرشے خدا ست

দুনিয়ার বুকে সব আমানত, আমরা শুধু কদিনের মালিক,
আসলে বন্ধু তাঁরই তো সব, মাখলুকাতের যিনি খালিক।

মানুষ তার শরীরেরও মালিক নয়; শরীরের মালিক আল্লাহ। এ জন্যই বলা হয়, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন—আমাদের সবকিছুই আল্লাহর আর আমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করব। এই যে হাত-পা, চোখ, মন-মস্তিষ্ক সবকিছুই আমাদের কাছে আল্লাহর আমানত। বসবাসের জন্য যে ঘর তিনি আমাদের দান করেছেন,

সেটাও আমার কাছে তাঁর আমানত। সন্তানসন্ততি দিয়েছেন, তা-ও আমানত। কারণ, পরিপূর্ণ মালিকানা কেবল তাঁরই। আমরা কিছুরই স্বাধীন মালিক নই যে, যা ইচ্ছা করে বেড়াব।

নবি শুআইব আ.-এর সম্প্রদায় কী বলেছিল? তারা বলেছিল, 'হে শুআইব, তোমার নামাজ (ইবাদত) কি তোমাকে এ শিক্ষা দেয় যে, আমরা সেসব উপাস্যকে পরিত্যাগ করব, যাদের উপাসনা করত আমাদের বাপদাদারা? আর নিজেদেরই সম্পদ নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো খরচ করার অধিকার আমাদের থাকবে না?'

পুঁজিবাদের আদর্শধারী কোনো ব্যক্তির চিন্তাভাবনা হবে, 'এই সম্পদ যেহেতু আমার, সেহেতু আমার যেভাবে ইচ্ছা তা খরচ করব—মনে চাইলে তা দিয়ে সুদি কারবার করব কিংবা কাউকে সুদের ওপর ঋণ দেবো।' যেহেতু সে নিজেকে এই অর্থসম্পদের মালিক মনে করে, সেহেতু যেভাবে ইচ্ছা অধিকার খাটানোর কথা ভাবে। বিপরীতে যদি সে নিজেকে এর 'আমানতদার' মনে করত, তাহলে তার দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্ন হতো। তখন সে নিজের হাতও সেখানেই ব্যবহার করত, যেখানে ব্যবহার করার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন। নিজের পা দিয়ে সে রাস্তায়ই চলত, যে রাস্তায় চলার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন। উপরন্তু নিজের ধনসম্পদও সেখানেই খরচ করত, যেখানে খরচ করার কথা আল্লাহ বলেছেন।

৩. পূর্ণ সমতা

সামাজিকভাবে তাওহিদের দাবি হচ্ছে—মৌলিকভাবে বলুন বা জন্মগতভাবে—সকল মানুষ সমান। উঁচু-নিচু কোনো ভেদাভেদ নেই। এই প্রসঙ্গে হারবার্ট জর্জ ওয়েলসের সাক্ষ্য তো আমরা আগেই

পেশ করেছি। তিনি বলেন, "যদিও ভ্রাতৃত্ব, সমতা ও স্বাধীনতার উপদেশ পৃথিবীতে বহুকাল আগেও অনেক দেওয়া হয়েছিল এবং এমন উপদেশমূলক কথা আমরা মাসিহের উপদেশমালাতেও প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি; কিন্তু এটা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই যে, মুহাম্মাদই এমন মনীষী, যিনি মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রথম এই মূলনীতিগুলোর ওপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।"

মুসলিম সমাজে যদি কোনো ভেদাভেদ থেকে থাকে, তবে তা ব্যক্তির গুণের ওপর নির্ভর করে হয়। যদি আপনি ইলম হাসিল করে থাকেন, তবে আপনি সবার কাছে সম্মানিত হিসেবে বরিত হবেন। আপনি তাকওয়া অর্জন করে থাকেন, আধ্যাত্মিক মাকাম হাসিল করেন; তবে সবাই আপনাকে সম্মানের চোখে দেখবে, মর্যাদাবান জ্ঞান করবে। কারণ, ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য ও সুমহান আদর্শ হচ্ছে, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ—'তোমাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড়ো মুত্তাকি, তিনিই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত'। জন্মগতভাবে সকল মানুষ সমান। অচ্ছুত বা ব্রাহ্মণ, সাদা অথবা কালো, নারী কিংবা পুরুষ—কোনো পার্থক্য নেই। তবে হ্যাঁ, নারী-পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্যের কথা শরিয়ত বলেছে, তা হচ্ছে ব্যবস্থাপনার দিক থেকে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। যেমন দেখুন, কোনো বিচার বিভাগের ইনচার্জ আর তার বাইরে দায়িত্ব পালন করা কর্মচারীর মধ্যে মানুষ হিসেবে মৌলিকভাবে কোনো পার্থক্য আছে? উত্তর হবে—নেই। কিন্তু পদপদবি ও কাজের অঙ্গনের দিক থেকে পার্থক্য আছে, তাই না? এটাকে বলে ব্যবস্থাপনার দিক থেকে তৈরি হওয়া তারতম্য বা ব্যবধান; নতুবা মানুষ হিসেবে দুজনই কিন্তু সমান। মানবিক সম্মান ও অধিকারের দিক থেকে ইসলাম দুজনের মধ্যে কোনো পার্থক্যরেখা টানেনি।

আমাদের এখানে সাধারণত পাঠানদের মধ্যে এমন সমতা দৃষ্টিগোচর হয়। সবাই একই ধরনের পোশাক পরে। বড়ো জমিদার হোক অথবা তার চাকরবাকর—উভয় শ্রেণির পোশাকই একই ধরনের হয়। এমনকি তারা খাবারও একসঙ্গে বসে খায়। যদ্দুর শুনেছি, আরবদের মধ্যেও সমতার এমন নজির পাওয়া যায়। লাঞ্চটাইমে দারোয়ান ও ড্রাইভার—দুজনই মিনিস্টারের সঙ্গে এক টেবিলে বসে আহার করে।

তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম, নারী-পুরুষের মধ্যে মানুষ হওয়ার দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু ব্যবস্থাপনার দিক থেকে। কুরআনের ভাষায়—

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ ... ﴿٣٤﴾

পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক। (সূরা নিসা : ৩৪)

অর্থাৎ, পুরুষরা পরিবারের পরিচালকের মর্যাদাপ্রাপ্ত। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, পুরুষ মর্যাদাবান আর নারীর কোনো মর্যাদা নেই। কারণ, এমনও হতে পারে, কোনো নারী নিজের অবদান ও কৃতিত্বের বিচারে হাজারো পুরুষকে ছাড়িয়ে মর্যাদার সুউচ্চে আরোহণ করতে সক্ষম হবে। আচ্ছা বলুন তো, এমন পুরুষের সংখ্যা কি আমরা গণনা করে শেষ করতে পারব, যারা মারইয়াম, আসিয়া, খাদিজা, আয়িশা, ফাতিমা রা. প্রমুখদের সম্মান ও মাহাত্ম্যের উচ্চতাকে এমনভাবে দেখে, যেভাবে কেউ আকাশ দেখে।

তাহলে তাওহিদের দর্শন থেকে আমরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক বিবেচনায় এই তিনটি প্রধানতম ফল দেখতে পাই :

> এক. হাকিমিয়্যাহ তথা সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য। জমিনের শাসনভারের ক্ষেত্রে মানুষের মর্যাদা প্রতিনিধির চেয়ে বেশি কিছু নয়। একে পরিভাষায় আমরা 'খিলাফত' বলি।

দুই. একচ্ছত্র মালিকানা বলতে যা বোঝায়, তা কেবল আল্লাহরই। বান্দার কাছে যা কিছু আছে, সবকিছু তার কাছে আল্লাহর আমানত। একে আমরা 'আমানত' বলতে পারি।

তিন. সমাজের সব মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। কারণ, জন্মগতভাবেই মানুষের মধ্যে কোনো মর্যাদাগত পার্থক্য নেই। একে পরিভাষায় 'মুসাওয়াত' বলা হয়। একে আমরা 'সমতা' বলে অভিহিত করে এসেছি।

রাসূল ﷺ মক্কার অলিতে-গলিতে ঘুরেফিরে তাওহিদের এই দর্শনই প্রচার করেছেন। বলেছেন—يَاأَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوا—'হে লোকসকল! বলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তবেই তোমরা সফল হবে'। দাওয়াতের প্রাথমিক সময়ে রাসূল ﷺ কিন্তু নিজের রিসালাতের কথাও খুব একটা বলেননি। সবটুকু জোর (emphasis) তাওহিদের ওপর দিয়েছেন। বিপ্লবী এই দর্শনের প্রচার-প্রসারে রাসূল ﷺ তদানীন্তন সময়ে যত প্রচারমাধ্যম ছিল, সব ব্যবহার করেছেন। ঘরে ঘরে গিয়ে তিনি তাওহিদের দাওয়াত পেশ করেছেন। এরপর দুবার নিজের বংশের (বনু হাশিম) লোকদের আপ্যায়নের জন্য ডেকে তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। প্রথমবার তো তারা তাঁর কথাই শোনেনি, হট্টগোল বাধিয়ে বসে। দ্বিতীয়বার সামান্য শোনে ঠিক, কিন্তু সবাই নিশ্চুপ পাথরের মতো বসে থাকে। উপস্থিতদের মধ্যে শুধু আলি রা. উঠে তাঁর ডাকে সাড়া দেন; যদিও তিনি এর আগেই ঈমান এনেছিলেন।

আলি রা. দাঁড়িয়ে সবার উপস্থিতিতে বলেন, 'যদিও আমার পায়ের গোছা এখনও পাতলা, বয়সে আমি সবার ছোটো, যদিও আমার দুটো চোখও পীড়িত, কিন্তু আমি আপনার দাওয়াতে সাড়া দিচ্ছি।

আমি সব সময় আপনাকে সঙ্গ দেবো'। আলি রা.-এর কথা শুনে সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে আর বলে, 'এ (মুহাম্মাদ) তো পথ ধরেছে বিপ্লব ঘটানোর, আর এ (আলি) তাঁর সঙ্গী হয়েছে'। এরপরই মূলত রাসূল ﷺ-এর ওপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে আদেশ আসে—

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٤﴾

(হে নবি,) আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে—আপনি প্রকাশ্যে তা শুনিয়ে দিন; মুশরিকদের পরোয়া করবেন না। (সূরা হিজর : ৯৪)

এ আদেশের প্রেক্ষিতেই রাসূল ﷺ সাফা পর্বতের ওপর দাঁড়িয়ে 'ওয়া সাবাহাহ' (হায়! ধ্বংস ধেয়ে আসছে!)-এর আওয়াজ তোলেন। তারপর উকাজ ও অন্যান্য মেলাগুলোতে গিয়ে দাওয়াত দেন। হজের সমাবেশগুলোতে লোকদের দাওয়াত দেন।

মোটকথা, তদানীন্তন সময়ে প্রচলিত যত পদ্ধতি ও উপায়-উপকরণ ছিল, তিনি সব কাজে লাগিয়েছেন। সে সময় না লাউড স্পিকার ছিল, না কোনো টেলিভিশন। ইলেকট্রনিক আর প্রিন্ট মিডিয়াও ছিল না। এমনিভাবে না কোনো প্রেস ছিল, না গ্রন্থ প্রকাশ করার মাধ্যম, আর না সংবাদপত্র! তবে যে প্রচারমাধ্যম আর উপকরণই ছিল, দাওয়াতের কাজে সবকিছু রাসূল ﷺ ব্যবহার করেছেন।

❀❀❀

ইসলামি বিপ্লব ও তার সাংগঠনিক বুনিয়াদ

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওপর যারা ঈমান এনেছেন, তিনি তাদের সংগঠিত করে তারবিয়াত প্রদান করেছেন। এই সংগঠনের প্রথম বুনিয়াদ ছিল, যারা এটা মেনে নিয়েছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর নবি। তিনি যা কিছু বলছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলছেন; কারণ, তা তাঁর ওপর ওহি হয়েছে। এ কথা মেনে নেওয়ার পর তাদের পক্ষে রাসূল ﷺ-এর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা কীভাবে সম্ভব? পৃথিবীতে আপনি এর চেয়ে মজবুত ও সুশৃঙ্খল সংগঠনের কথা কল্পনাও করতে পারবেন না, যে সংগঠন নবুওয়াতের বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কথাটি ভালোভাবে হৃদয়ে গেঁথে নিন!

বর্তমান যুগেও আপনি এর উদাহরণ পাবেন যে, সত্য নবুওয়াত তো সংগঠনের অনেক বড়ো বুনিয়াদই—এটা বলার অপেক্ষা রাখে না; এমনকি মিথ্যা নবুওয়াত পর্যন্ত বড়ো বুনিয়াদের ভূমিকা রাখে। মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির মিথ্যা নবুওয়াতের বুনিয়াদের ওপর যে সংগঠনটি পরিচালিত হচ্ছে, তাদের কথাই ভাবুন না! কোথায় থেকে কোথায় পৌঁছে গেছে এরা। বিপরীতে তাদের লাহোরি ফিরকা—যারা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানিকে নবি মানেনি, তাদের অবস্থা দেখুন! ধীরে ধীরে বিক্ষিপ্ত হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

তাহলে বোঝা গেল, পৃথিবীতে সবচেয়ে মজবুত ও সুশৃঙ্খল কোনো সংগঠন যদি হতে পারে, তবে তা কেবল নবুওয়াতের বুনিয়াদের ওপরই হওয়া সম্ভব। এ কারণেই রাসূল ﷺ-এর সত্য ও শেষ নবি হওয়ার বুনিয়াদের ওপর যে সংগঠনটি তৈরি হয়েছিল, তা পৃথিবীর সবচেয়ে মজবুত, শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল সংগঠন ছিল। যার ব্যাপারে কুরআনেও বলা হয়েছে—

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ... ﴿٢٩﴾

> আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ এবং তাঁর সঙ্গে যারা আছেন। (সূরা ফাতহ : ২৯)

এই সংগঠনের কেউ রাসূল ﷺ-কে সংগঠনের আমির নির্বাচিত করেনি; বরং রাসূল ﷺ নবি ও দাঈ হওয়ার কারণে নিজেই আমির ও প্রধান ছিলেন। তাঁর সঙ্গীরা سمعنا وأطعنا (শুনেছি ও মেনেছি)-এর উসুলের অনুগামী ছিলেন। তারপরও রাসূল ﷺ অনাগতদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে এবং ভবিষ্যতে যদি তাদের এই বিপ্লবের পথে হাঁটতে হয়, তাহলে কীভাবে তারা সংগঠন বানাবে সেটা বোঝাতে—বাইয়াতের কাজ শুরু করেন।

উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস পেশ করছি, যা ইমাম বুখারি ও মুসলিম দুজনই বর্ণনা করেছেন। সনদের দিক থেকে এর চেয়ে বিশুদ্ধ হাদিস হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তিনি বলেন, بَايَعْنَا رَسُول الله 'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করি', عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ 'শোনা ও আনুগত্য করার ওপর', فِي العُسْرِ واليُسْرِ 'অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অবস্থায়', وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا 'তিনি আমাদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দিলেও'। আমরা কখনও এ কথা বলব না,

'আপনি একজন নওজোয়ানকে আমাদের আমির বানিয়ে দিয়েছেন? আপনার প্রবীণ অনেক সঙ্গী আছে, আমাদের ওপর এ নওজোয়ানকে কেন আমির বানিয়েছেন?' আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে, আপনার যা ইচ্ছা করবেন। وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا. لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ 'আর যেখানেই থাকি, অবশ্যই আমরা সত্য বলব। আল্লাহর ব্যাপারে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করব না'। আমাদের কাছে যে বিষয়টি সঠিক মনে হবে, আমরা তা দ্বিধাহীনচিত্তে বলে দেবো। লোকদের তিরস্কারের ভয়ে মুখ বন্ধ করে বসে থাকব না। এটা ছিল সংগঠনের দ্বিতীয় বুনিয়াদ।

পাঠক! এবার আপনারাই ভেবে দেখুন, আসলেই কি রাসূল ﷺ-এর জন্য সাহাবিদের কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণের আদৌ প্রয়োজন ছিল? তাঁর সব আদেশ মানার জন্য ঈমান আনাই কি যথেষ্ট ছিল না? কুরআনের ভাষায়—

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللهِ ... ﴿٦٤﴾

আমরা সব রাসূলকে এ উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি যে, মানুষ আল্লাহর নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করবে। (সূরা নিসা : ৬৪)

এরপরও রাসূল ﷺ বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। এর পেছনের উদ্দেশ্য কী? এর পেছনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অনাগতদের দিকনির্দেশনা দেওয়া। তাদের জন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করে যাওয়া।

গাজওয়ায়ে বদরের আগে রাসূল ﷺ একটি পরামর্শসভার আয়োজন করেছিলেন। পরামর্শের বিষয় ছিল, উত্তর দিক থেকে কুরাইশদের একটি ব্যবসায়ী কাফেলা আসছে, যার সুরক্ষায় নিয়োজিত আছে মাত্র ৪০-৫০ জন অস্ত্রধারী। অন্যদিকে দক্ষিণ থেকে বিশাল এক সশস্ত্র

বাহিনী ধেয়ে আসছে। আর আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, উত্তর-দক্ষিণ থেকে আসা দুদলের মধ্য থেকে যেকোনো একটির ওপর তোমাদের অবশ্যই তিনি বিজয় দান করবেন।

উপস্থিত সাহাবিদের কাছে পরামর্শ চেয়ে রাসূল ﷺ বলেন, এবার তোমরা পরামর্শ দাও, আমাদের কোনদিকে যাওয়া উচিত? সভায় উপস্থিত কেউ কেউ বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল, ব্যবসায়ী কাফেলার দিকে চলুন! সামান্য কিছু মানুষ আছে, আমরা তাদের খুব সহজেই কাবু করে ফেলব। এতে গনিমত হিসেবেও আমাদের হাতে অনেক কিছু এসে যাবে। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রও আমরা পেয়ে যাব; যার প্রয়োজন আমরা তীব্রভাবে অনুভব করছি।

তাদের কথা শোনার পরও রাসূল ﷺ আবারও পরামর্শ তলব করেন। সাহাবিগণ বুঝে যান, রাসূল ﷺ-এর ইচ্ছা ভিন্ন কিছু। বিষয়টি বুঝতে পারার পর প্রথমে মুহাজির সাহাবিরা বলেন, আপনি আমাদের কাছে কী জিজ্ঞেস করছেন? আপনার যা আদেশ হবে, তাতেই আমরা হাজির! আবু বকর ও উমর রা. প্রমুখ সাহাবি একে একে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন; কিন্তু রাসূল ﷺ তাতে বিশেষ আগ্রহ দেখালেন না। এতে সাহাবিরা অনুভব করতে পারছিলেন, রাসূল ﷺ বিশেষ কোনো কিছুর অপেক্ষা করছেন।

মুহাজিরদের মধ্য থেকেই মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রা. দাঁড়িয়ে বলেন, 'আপনার যা ইচ্ছা, আমাদের আদেশ করুন! আমাদের মুসা আ.-এর সঙ্গীদের মতো পাবেন না, যারা মুসা আ.-কে বলেছিল, "হে মুসা! আপনি আর আপনার প্রতিপালক গিয়ে যুদ্ধ করুন! আমরা তো এখানে বসে আছি"। হতে পারে, আল্লাহ আমাদের মাধ্যমে আপনাকে প্রশান্তি দান করবেন।'

মিকদাদ রা.-এর কথা শেষ হলেও রাসূল ﷺ-কে দেখে মনে হলো, তিনি যেন অন্য কিছুর অপেক্ষায় আছেন! এরই মধ্যে সাআদ ইবনে মুআজ রা.-এর মনে হয়, রাসূল ﷺ মূলত বিশেষভাবে আনসারদের মতামত জানার অপেক্ষা করছেন। কারণ, বাইয়াতে আকাবার দ্বিতীয় মজলিসে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, কুরাইশরা যদি রাসূল ﷺ-এর পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে মদিনার ওপর আক্রমণ করে বসে—তখন আমরা সেভাবে তাঁর সুরক্ষা নিশ্চিত করব, যেভাবে নিজ পরিবারের করে থাকি। কিন্তু এখনকার অবস্থা ভিন্ন—কুরাইশরা তখন মদিনার ওপর আক্রমণ করেনি। এখন রাসূল ﷺ নিজে মদিনা থেকে বের হয়ে যুদ্ধ শুরু করতে চাচ্ছিলেন।

বাইয়াতে আকাবার দ্বিতীয় মজলিসে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে কুরাইশরা মদিনার ওপর আক্রমণ করলে আনসাররা তাদের প্রতিরোধে যুদ্ধ করতে বাধ্য ছিল; কিন্তু মদিনা থেকে বের হয়ে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তো তারা বাধ্য নন। এ জন্যই মূলত রাসূল ﷺ বিশেষভাবে আনসারদের মতামত বা সমর্থনের অপেক্ষা করছিলেন। বিষয়টি যখন সাআদ রা. বুঝতে পারেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, যদ্দুর আন্দাজ করতে পারছি, আপনি বিশেষভাবে আমাদের মতামত জানতে চাচ্ছেন?'

সামনের কথাটি সবাই খেয়াল করে দেখুন, সাআদ রা. কতই-না উত্তম বাক্য ব্যবহার করে নিজেদের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেছেন! তিনি বলেছেন—فانا آمنابك وصدقناك—আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনাকে সমর্থন করেছি'। তো আমরা যেহেতু আপনাকে আল্লাহর নবি ও রাসূল হিসেবে মেনেই নিয়েছি, এখন আবার আমাদের এখতিয়ার কোথায়? আপনি যে আদেশই দেবেন,

তা আমাদের মাথার ওপর! যেখানে ইচ্ছা আমাদের নিয়ে যাবেন। আল্লাহর শপথ! যদি আপনি ঘোড়াসহ সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেও বলেন, কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই আমরা ঝাঁপ দেবো।

অতএব, রাসূল ﷺ-এর তখন কারও বাইয়াত গ্রহণের প্রয়োজন ছিল না। তিনি আল্লাহর নবি ও রাসূল হওয়ার কারণে এমনিতেই অনুসরণীয় ছিলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও সাহাবিদের তিনি কেন বাইয়াতবদ্ধ করেছেন? নবি হওয়ার পরও তিনি সাহাবিদের বাইয়াত নিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে মুসলমানদের কোনো সংগঠন বানানোর প্রয়োজন হলে, তারা ইংরেজ, রুশ বা জার্মানদের থেকে নিয়মনীতি ধার করতে না শুরু করে; বরং সেই নিয়মনীতিকেই সংগঠনের বুনিয়াদ বানায়, যা তিনি ﷺ রেখে গেছেন।

বিপ্লবী সংগঠন ও তারবিয়াতের নববি পদ্ধতি

তারবিয়াতের জন্য চারটি বিষয় সবিশেষ লক্ষণীয়, যার ব্যাপারে আমি তারবিয়াত প্রসঙ্গে আগের আলোচনায় মোটামুটি আভাস দিয়েছি। এখানে আরও কিছুটা বিস্তৃতভাবে বলছি।

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, বিপ্লবের যে দর্শন—সব সময় তা মন ও মননে ধারণ করতে হবে। রাসূল ﷺ-এর বিপ্লবী দর্শন ও চিন্তাধারার মূল উৎস ছিল কুরআন। সেই ধারাবাহিকতায় আজও যে ইসলামি আন্দোলন পরিচালিত হবে, তারও মূল উৎস হবে এ কুরআনই। ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে কুরআন পাঠ করতে হবে এবং এই পাঠ অব্যাহত রাখতে হবে, যেন বিপ্লবের দর্শনও সব সময় চর্চিত হতে থাকে। এর জন্য কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনারও ব্যবস্থা করা যায়, যাকে পরিভাষায় 'মুজাকারা' বলে। কর্মীরা একসঙ্গে বা ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বসবে। তারপর কুরআন পড়বে, শিখবে ও শেখাবে। এর সবচেয়ে বড়ো ফায়দা এটাই যে, এতে তাদের ভেতরে লালন করা বিপ্লবের সেই দর্শনও সর্বদা সতেজ এবং জাগরূক থাকবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, 'শোনা এবং মানা'। এক্ষেত্রে কর্মীদের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা হলো, তাদের যদি কেটে টুকরো টুকরোও

করে ফেলা হয়, তারপরও কোনো প্রতিরোধ করা যাবে না। দেখুন, একজন ব্যক্তি যখন বুঝতে পারবে—এরা আমাকে হত্যা করবে, তখন বেচারা দিশেহারা হয়ে (desperate) হয়ে দু-চারজনকে মেরে তারপর নিজে মরবে। একটি বিড়ালকেই দেখুন না! যখন কোনো বিড়ালকে কোণঠাসা (corner) করে ফেলবেন আর বিড়ালটিও বুঝতে পারবে, এখন তার জন্য বের হওয়ার আর কোনো পথ খোলা নেই, তখন সে সোজা আপনার দুর্বল পয়েন্ট অর্থাৎ চোখে আঘাত করে বসবে। কিন্তু এখানে বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এ অবস্থায় প্রতিরোধের কোনো সুযোগ নেই।

সাহাবি খাব্বাব ইবনে আরাত রা.-কে আগুনের অঙ্গার বিছিয়ে তাতে শুয়ে দেওয়া হয়। তিনি কোনো প্রতিরোধ করা ছাড়াই তা সইতে থাকেন। পিঠের চামড়া জ্বলে যায়। চর্বি গলে যায়। বিগলিত চর্বিতে অঙ্গার পর্যন্ত নিভে যায়। একটু ভেবে দেখুন তো! আপনি যদি দেখতে পান, দুশমন আপনাকে আগুনে ঝলসে দেবে, তখন আপনি কী করবেন? নিশ্চয় দু-চারজনকে মেরেই মরবেন? কিন্তু ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের তারবিয়াতের এই অধ্যায়ে এসবের অনুমতি নেই। এ পর্যায়ে কোনো প্রতিরোধ চলবে না। আমার মতে, শোনা ও মানার ক্ষেত্রে এর চেয়ে আশ্চর্যজনক ও কঠিন আর কোনো রূপ হতেই পারে না।

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে, নিজের জানমাল ও সন্তানসন্ততি থেকে শুরু করে সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করার মানসিকতা থাকতে হবে। এমনিতেই পার্থিব চিন্তাধারা থেকে সংগঠিত বিপ্লবগুলোতেও লোকেরা এসব উৎসর্গ করে থাকে। কমিউনিস্ট বিপ্লব কখনও সংঘটিত হতো না, যদি লোকেরা জানমাল উৎসর্গ না করত, সব ধরনের দুর্দশা মাথা পেতে না নিত। বিপরীতে মুসলমানদের জন্য

আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জানমালের কুরবানি পেশ করা এত সহজ যে, অন্যদের পক্ষে তা কল্পনা করাও অসম্ভব। কারণ, মুসলিমরা আখিরাতে ইয়াকিন রাখে। তাদের কাছে পরকালের জীবনই আসল জীবন। তারা যদি আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের সবকিছু কুরবানিও করে দেয়, এতে তাদের লোকসানের কোনো চিন্তা নেই। তাদের তো বিশ্বাসই হচ্ছে এমন যে, পৃথিবীতে আমি যা কিছুর কুরবানি পেশ করব, আখিরাতে তার অনেক গুণ এমনকি সাতশো গুণ, হাজার গুণ বেশি পাব। সুতরাং এতে লোকসানের তো প্রশ্নই আসে না!

পারতপক্ষে একজন ব্যক্তির পরকালের ওপর বিশ্বাস যত মজবুত হবে, সে আল্লাহর রাস্তায় নিজের সবকিছু উৎসর্গ করার প্রতি ততই বদ্ধপরিকর হবে। কারণ, আমার জানা আছে, পৃথিবীতে যা কিছুই খরচ করব, পরকালের জীবনে আমি তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি লাভ করব; এরপরও যদি আমি নিজের পুঁজিগুলো ব্যাংকে গচ্ছিত রেখে দিই, তাহলে আমার চেয়ে বড়ো বোকা ও হতভাগা আর কে হতে পারে? ব্যাংক আমাকে বেশির বেশি দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট মুনাফা দেবে; কিন্তু আল্লাহর ব্যাংক পড়ে আছে—যা আমাকে সাতশো গুণ বেশি মুনাফা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তো এরপরও আল্লাহর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ না করে এখানে সঞ্চিত করে রাখা নিশ্চয় বোকামি বৈ কিছুই নয়? যেমনটা নবি ইসা আ. বলেছিলেন—

> পৃথিবীতে কিছু সঞ্চয় করে রেখো না। এখানে পোকামাকড় জিনিস নষ্ট করে। চুরি-ডাকাতিরও আশঙ্কা থাকে। আসমানে জমা করো, সেখানে পোকামাকড় নষ্ট করতে পারে না, চুরির আশঙ্কাও নেই। আর তোমাদের একটি পরম বাস্তবতার কথা বলব? মনে রাখবে—যেখানে তোমাদের সম্পদ হবে, তোমাদের মন-দিলও সেখানেই পড়ে থাকবে।

তোমরা যদি পৃথিবীতে ধনসম্পদ সঞ্চয় করো, তাহলে তোমাদের মন ও দিল এখানে আটকা পড়ে থাকবে। যখন ফেরেশতারা জান কবজ করতে আসবে, তখন হতাশা আর আফসোস ছাড়া কিছুই বাকি থাকবে না। হাদিসে এসেছে, ফেরেশতারা এমনভাবে জান কবজ করবে, যেভাবে গরম শিক থেকে কাবাব টেনে বের করা হয়। এর বিপরীতে আপনার সম্পদ যদি আল্লাহর ব্যাংকে জমা হয়, তাহলে আপনার অন্তরও সেখানেই পড়ে থাকবে। মৃত্যুর সময় যখন জান কবজ করতে ফেরেশতারা আসবে, তখন আপনার ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির আভা লেগে থাকবে। কবির ভাষায়—

نشان مرد مومن با تو گویم -

چو مرگ آید تبسم بر لب اوست

একজন প্রকৃত মুমিনের পরিচয় বলছি তোমায় আমি,
ঠোঁটে মুচকি হাসি রেখেই শেষ হবে তাঁর জিন্দেগানি।

দেখুন, বিষয়টি বোঝার জন্য আরও সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। বলুন তো, আপনি যদি কোটি টাকা সুইস ব্যাংকে জমা রেখে থাকেন আর আপনাকে বলা হয়, 'দেশ ছেড়ে চলে যাও!', তাহলে আপনার তেমন কোনো আফসোস হবে? কিন্তু যদি বাইরের দেশের কোনো ব্যাংকে আপনার কোনো অর্থকড়ি না থাকে, কোনো চেনাপরিচিত মানুষও না থাকে আর এ অবস্থায়ই আপনাকে বলা হয়, 'যাও, দেশ থেকে বেরিয়ে যাও!', তখন নিশ্চয় আপনি অনেক পেরেশানিতে ভুগবেন। এটা মূলত পরকালের প্রতি বিশ্বাসেরই ফল, যা আজকের পৃথিবীর মানুষদের বুঝে আসছে না; তাই তারা ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, চেচনিয়া, বসনিয়া ও আফগানিস্তানে মুসলমানদের জানের কুরবানির জযবা দেখে বলছে, 'মুসলমানদের এ কেমন হাল যে, তারা নিজেদের

জানের কুরবানি পেশ করতে পর্যন্ত কোনো পরোয়া করছে না!' এসব যে পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসেরই আলামত—এতে সন্দিহান হওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

যখন মাওলানা মওদূদী রহ.-কে মৃত্যুর সাজা শোনানো হয়েছিল, তখন আমি ইসলামি জমিয়তে তলাবার প্রধান দায়িত্বশীল ছিলাম। 'আজম'—দৃঢ় প্রত্যয়, অটুট মনোবল ও অবিচলতা নিয়ে রচিত কবিতাটি ছাপিয়ে আমি মাওলানার কাছে কারাগারে পাঠিয়েছিলাম—

وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے

بتا رہی ہے یہ ظلمتِ شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے

ابھی ہیں کچھ امتحان باقی ' فلاکتوں کے نشان باقی

قدم نہ پیچھے ہٹیں کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے

سیاہیوں سے حزیں نہ ہونا' غموں سے اندوہ گیں نہ ہونا

انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے

رئیسؔ اہلِ نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہاریں

جسے سمجھتے تھے آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے!

সে সময়ও আসবে, কুদরত আমাদের মেহনতের ফল দেবে।
লোকেরা বলছে, প্রভাত নিকটে, এ রাতের তমসা বিদূরিত হবে।
এখনও বাকি আছে কিছু ইমতিহান, বাকি দুর্ভাগ্যের বহু নিশান,
পিছু হটবে না হে মুসাফির, বাকি আজও কিছু নিয়তির দাস্তান।
বিচলিত হবে না আঁধারে, হবে না হতাশার ভারে কুপোকাত,
আভাস দিচ্ছে, রাতের কালো এ পর্দার আড়ালেই আছে জীবনের রাঙা প্রভাত।

আর বলছে, যুগসচেতন সেই নেতাকে বলে দাও, বিপদে যেন ভারাক্রান্ত না হয়,
কারণ, যাকে এতদিন পরীক্ষা ভাবত, তা-ই হবে জীবনের এক কঠিন সময় বোধহয়।

এটি রইস আমরহবির কবিতা। রইসের কবিতাটি আমিও আরেক 'রইসে আহলে নজর' (যুগসচেতনদের নেতা)-এর খেদমতে পেশ করেছিলাম।

রাসূল ﷺ-এর বিপ্লবের মেহনতে আধ্যাত্মিক তারবিয়াতকেও খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। আধ্যাত্মিকতা তৈরির সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম হিসেবে কুরআনকে হৃদয়ে স্থান করে দেওয়া হয়েছিল। তার মাধ্যমে বিপ্লবীদের হৃদয়ালোককে করা হয়েছিল উদ্ভাসিত। এরই সঙ্গে প্রবৃত্তির তাড়নাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছিল যথার্থরূপে। আল্লাহর রাস্তায় জাগ্রত থাকার প্রতি উৎসাহিত করা এবং তাহাজ্জুদে কুরআনকে নিজেদের হৃদয়ের গভীরে স্থান করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন—

يَآَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿٣﴾ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا ﴿٦﴾

হে বস্ত্রাবৃত! রাতে ইবাদতের জন্যে দাঁড়ান; তবে কিছু অংশ ছাড়া। রাতের অর্ধেক বা তার চেয়ে কিছুটা কম অথবা তার চেয়ে একটু বাড়ান। আর সেসময় আপনি

তারতিলের সঙ্গে[৭] কুরআন তিলাওয়াত করুন। নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি এক অতি ওজনদার বাণী নাজিল করছি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাত্রিজাগরণ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য খুব উপযোগী। (সূরা মুযযাম্মিল : ১-৬)

কুরআন তো এমনিতেই নূর, যা অন্তরের যাবতীয় অন্ধকার দূর করে তা আলোকিত করার শক্তি রাখে। আর রাত্রিজাগরণ প্রবৃত্তিকে দমন করার ক্ষেত্রে খুবই প্রভাবক সাব্যস্ত হয়। তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধির জন্য তৃতীয় যে বিষয়টির ওপর উৎসাহিত করা হয়েছে তা হলো, আল্লাহর রাস্তায় ধনসম্পদ ব্যয় করা।

তারবিয়াত প্রসঙ্গে এতক্ষণ যা কিছু বলেছি, এগুলো ছিল রাসূল ﷺ-এর তারবিয়াত প্রদানের তরিকা। আমাদের এখানে পরবর্তী সময়ে খানকাকেন্দ্রিক যে তরিকা অস্তিত্বে এসেছে, তাতে তারবিয়াত ও তাযকিয়ার অনুসৃত রীতিনীতি অনেক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তাদের মুরাকাবা, চিল্লা ও জিকিরের নিয়মনীতিও কিছুটা ভিন্নতর। আমি সেই তরিকার কথা বলছি না। আমি সুলুকে মুহাম্মাদির কথা বলছি। বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য যেই তারবিয়াত প্রয়োজন, সেই তারবিয়াতের কথা বলছি। সেই তারবিয়াতের কথা বলছি, যা রাসূল ﷺ তাঁর প্রিয় সাহাবিদের প্রদান করেছিলেন। প্রিয় পাঠক! মোটাদাগে আমি সেই তারবিয়াতের মূল উপাদানগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

৭. ধীরে ধীরে, শান্তভাবে, সুস্পষ্ট উচ্চারণে, অর্থের দিকে মনোযোগী হয়ে কুরআন পড়াকে 'তারতিল' বলে।

রাসূল ﷺ-এর বিপ্লবী কর্মসূচিতে সবরের ধাপ

আগেই বলেছিলাম, সবরের ধাপের সূচনা হয় দাঈর ব্যক্তিত্বহরণের মধ্য দিয়ে; যার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, দাঈর ইচ্ছাশক্তি নষ্ট করে দেওয়া। তিন বছর পর্যন্ত রাসূল ﷺ একা মক্কার মুশরিকদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিলেন। প্রথমে এই আক্রমণের ধরন ছিল মৌখিক। কেউ বলছে, আরে! এ তো পাগল হয়ে গেছে! কেউ বলছে, এর মধ্যে উন্মাদনা ভর করেছে। কেউ বলছে, আমরা তাকে বলেছি হেরা গুহায় না যেতে। সেখানে গিয়ে এভাবে কয়েকদিন করে অবস্থান না করতে। আমাদের তো মনে হয়, সেখানেই তার ওপর কোনো দানব আছর করেছে কিংবা তাকে জিনে ধরেছে। আবার কেউ বলছে, সে কাব্যচর্চা শুরু করেছে, জাদুকর হয়ে গেছে বা জাদুগ্রস্ত হয়েছে। এসব ছিল রাসূল ﷺ-এর ব্যক্তিত্বহরণ (Character Assassination) এবং তাঁর ইচ্ছাশক্তি নিঃশেষ করার অপচেষ্টা। মনে করবেন না যে, এসব জবানি আক্রমণে রাসূল ﷺ কষ্ট পেতেন না। কুরআন সাক্ষ্য দেয়—

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿٩٧﴾

হে নবি! আমি জানি- -তারা যা বলে, তাতে আপনার বক্ষ সংকুচিত হয়ে যায়। (সূরা হিজর ৯৭)

আমি জানি, তাদের বলা কথায় আপনি কষ্ট পান, ব্যথিত হয় আপনার হৃদয় আর এটা ভেবে আপনার বক্ষ সংকুচিত হয়ে যায় যে, একসময় যারা আমাকে আস-সাদিক (সত্যবাদী) ও আল-আমিন (পরম আমানতদার) বলে ডাকত, আজ তারাই আমাকে জাদুকর আর মিথ্যুক বলছে! আমার ওপর মিথ্যা ও প্রতারণার অপবাদ দিচ্ছে; কিন্তু এমন অবস্থায়ও রাসূল ﷺ-এর ওপর নির্দেশ ছিল—

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾

তারা যা কিছু বলছে, এর ওপর আপনি সবর করুন। আর উত্তমভাবে তাদের পরিত্যাগ করুন। (সূরা মুযযাম্মিল : ১০)

সুন্দরভাবে আপনার রুখ পরিবর্তন করে ফেলুন। তাদের ছেড়ে অন্যদের সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত হয়ে পড়ুন; কিন্তু তাদের থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নেবেন না। কারণ, হতে পারে আজ যে ব্যক্তি আপনার কথায় কর্ণপাত করছে না, কাল সে-ই আপনার কথা শোনার জন্য আগ্রহ দেখাবে।

এভাবেই তিন বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। তিন বছর পর মুশরিকরা উপলব্ধি করতে পারে, এ তো পাহাড়ের মতো অটল-অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একমনে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। উলটো এখন আমাদের সামনে দুটি আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রথম আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, আমাদের নতুন প্রজন্ম তাঁর আশেপাশে একত্রিত হচ্ছে। এই তো বনু উমাইয়ার চোখের মণি উসমান পর্যন্ত তাঁর দলে শামিল হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় ও সবচেয়ে বড়ো আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, আমাদের দাসরা তাঁর ওপর ঈমান নিয়ে আসছে। এমন ভয়ংকর অবস্থার তুলনা হতে পারে কেবল এমন অবস্থারই সঙ্গে যে, কোথাও বারুদ গুদামজাত করা হচ্ছে আর সেই গুদামের দিকেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

উড়ে যাচ্ছে। আমাদের দাসরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাদের ওপর করা জুলুমের প্রতিশোধ নিতে শুরু করে—ভাবা যায়, তাহলে পরিস্থিতি কোনদিকে গড়াবে? এসব উপলব্ধি থেকেই এবার তারা শারীরিক নিপীড়নের (Physical Persecution) পথ বেছে নেয়। যারাই মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারী হচ্ছে, তাদের ওপরই নির্যাতনের খড়গ নেমে আসছে। নির্দয়ভাবে পেটানো হচ্ছে, নির্মমভাবে শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছে, ভুখা রাখা হচ্ছে, ঘরবন্দি করা হচ্ছে, আবার অনেককে তো শেকলবদ্ধও করে রাখা হচ্ছে। আর দাস হলে তো কথাই নেই; নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যাচ্ছে। নির্দয় নির্মমভাবে পেটানো হচ্ছে এবং শেকলে বেঁধে অলিতে-গলিতে টানাহ্যাঁচড়া করা হচ্ছে।

সুমাইয়া ও ইয়াসার রা.-এর ওপর নির্মম ও ভয়ানক নির্যাতন করে আবু জাহল তাদের শহিদ করে দেয়। যুবক ছেলে আম্মার ইবনে ইয়াসারকে খুঁটিতে বেঁধে তার সামনে সুমাইয়া রা.-কে বিবস্ত্র করে নির্যাতন চালানো হয়। প্রহার করতে করতে একপর্যায়ে যখন ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন বলে—একবার হলেও বলো যে, 'তোমাদের উপাস্যও সত্য; তাহলে তোমাদের ছেড়ে দেবো'। এই কথা শুনে আবু জাহলের মুখের ওপর থুতু নিক্ষেপ করেন তারা। এরপর ক্রুদ্ধ হয়ে আবু জাহল সুমাইয়া রা.-এর লজ্জাস্থানে বর্শা দিয়ে আঘাত করে, যা তাঁর শরীরকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। ইয়াসার রা.-এর শরীরকে চারটি হিংস্র উটের সঙ্গে বেঁধে সেগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন চার দিকে দৌড় দিতে বাধ্য করা হয়। এতে ইয়াসার রা.-এর পুরো শরীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এমন করুণ ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ ছিল, كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ—'এখনও নিজেদের হাত বেঁধে রাখো!'

এর পেছনের ফালসাফা বা কারণ কী, তা আমরা আগেই বলে এসেছি। এখানে আবারও তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। প্রথমত, মুসলিমদের সংখ্যা তখন কম। তখন যদি তারা কোনো ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করত, তাহলে মুশরিকরা তাদের সমূলে উপড়ে ফেলত; অথচ একটি শক্তি হয়ে আবির্ভূত হওয়ার জন্য তখনও তাদের প্রয়োজন ছিল সময়ের। দ্বিতীয়ত, এভাবে একতরফা জুলুম-নির্যাতনের শিকার হওয়ার কারণে তারা জনসাধারণের সহমর্মিতা লাভ করছিল। বিলাল রা.-এর গলায় রশি বেঁধে তার মনিব সেই রশি রাস্তার ছোকরাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করতে বলত। যেমনটা সাম্প্রতিক সময়ে আবু গারিবের বন্দিদের ওপর নির্যাতনের কিছু ছবি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলোতে বন্দিদের বিবস্ত্র করে গলায় রশি বেঁধে নির্মমভাবে টানাহ্যাঁচড়া করতে দেখা যাচ্ছে।

বিলাল রা.-এর সঙ্গে এমন আচরণ মক্কার অলিতে-গলিতে করা হয়েছে। রৌদ্রতপ্ত পাথুরে ভূমিতে তাকে এমনভাবে টানাহ্যাঁচড়া করা হতো, তদানীন্তন সময়ে কোনো জানোয়ারের লাশকেও হয়তো তেমনটা করা হতো না। সাধারণ মানুষ এই দৃশ্য দেখত আর ভাবত, বিলালের সঙ্গে কেন এমন করা হচ্ছে? সে কি চুরি করেছে কিংবা তার মনিবের মেয়ের ইজ্জতে হাত দিয়েছে? তারা জানত, এমন কিছুই হয়নি। বিলালের একমাত্র অপরাধ হচ্ছে, সে বলত—'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল'। এর ফায়দা ছিল ব্যাপক। কোনো ধরনের প্রতিরোধ না করে এমন সয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তাদের জন্য সাধারণ মানুষের সহমর্মিতা ও হৃদয়ের আকুতি দিনদিন বেড়েই যাচ্ছিল।

এখানে একটি বিষয় নোট করে নিন যে, নবুওয়াতের দশ বছর পর্যন্ত রাসূল ﷺ-এর ওপর কেউ হাত উঠাতে পারেনি। এর কারণ ছিল, তখন রাসূল ﷺ নিজের গোত্র বনু হাশিমের আশ্রয়ে ছিলেন। যদিও বনু হাশিমের সবাই ঈমান আনেনি—তাদের মধ্যে আবু লাহাবের মতো নিকৃষ্ট দুশমনও ছিল—কিন্তু বনু হাশিমের সরদার ছিলেন আবু তালিব; যিনি রাসূল ﷺ-এর সুরক্ষা নিশ্চিত করেছিলেন। তখনকার সময়ে তাদের গোত্রের রীতি ছিল, গোত্রের সরদার যাকে নিরাপত্তা দেবে, পুরো গোত্র তা একবাক্যে মেনে নেবে। এ কারণেই মক্কার মুশরিকরা যখন বনু হাশিমকে তিন বছর পর্যন্ত অবরুদ্ধ[৮] করে রাখে, তখন শুধু মুসলিমরাই নয়; বরং পুরো গোত্রই সেই অবরোধের আওতায় পড়েছিল। আবু তালিবের কাছে মক্কার মুশরিকদের দাবি ছিল, তিনি যেন মুহাম্মাদকে আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করে দেন। এতে তারা সরাসরি তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়ায় যেতে পারবে। আবু তালিব তাদের দাবি পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

নবুওয়াতের দশম বছর আবু তালিবের মৃত্যু হয়। একই বছর খাদিজা রা.-ও ইন্তেকাল করেন। রাসূল ﷺ যখন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে আসতেন, মানুষের গালমন্দের কারণে যখন বিষণ্ন হতেন, তখন নিজের ঘরে নয়নজুড়ানো নিবেদিতা ও মহৎপ্রাণ স্ত্রী খাদিজার উপস্থিতিতে প্রশান্তি পেতেন। সেই প্রশান্তির অবলম্বনকেও আল্লাহ তায়ালা তুলে নেন। অন্যদিকে আবু তালিব গোত্রগতভাবে তাকে সঙ্গ দিতেন, তার ছায়াও উঠে যায়। এই বছরকে রাসূল ﷺ 'আমুল হুজন' বা 'দুঃখের বছর' বলে অভিহিত করেন। আবু তালিবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রাসূল ﷺ-এর গোত্রীয় সুরক্ষা শেষ হয়ে যায়।

---

৮. এই বয়কট 'শি-বু আবি তালিব' বা 'শি-বু বানি হাশিম'-এর ঘটনা হিসেবে সিরাতগ্রন্থাদি ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।—অনুবাদক

এরই পরিপ্রেক্ষিতে মূলত দারুন নাদওয়ায় মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরামর্শ দেওয়া হয়, নির্দিষ্ট কেউ এ হত্যাকাণ্ড ঘটাবে না। কারণ, তাতে করে পুরো বনু হাশিম হত্যাকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। তাই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সব গোত্র থেকে একজন করে যুবককে নেওয়া হবে, যারা একসঙ্গে গিয়ে আক্রমণ করবে। তাতে এটা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে যাবে, কে তাকে হত্যা করেছে। আর এতগুলো গোত্রের মানুষের বিরুদ্ধে বনু হাশিম কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না।

মক্কার ভূমি সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেখে রাসূল ﷺ তায়েফ সফর করেন। প্রত্যাশা ছিল, সেখানকার কোনো আমির বা সরদার ঈমান আনলে মক্কা ছেড়ে তিনি তায়েফকেই দাওয়াতের প্রাণকেন্দ্র বানাবেন। এমনটা ভেবেছিলেন ঠিক, কিন্তু সেখানে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে তিনদিনে যা কিছু হয়েছে, মক্কার দশ বছরেও তা হয়নি। রাসূল ﷺ-এর ওপর পাথর বর্ষণ করা হয়েছে, তাকে ভয়াবহ নির্যাতনের নিশানা বানানো হয়েছে এবং পুরো দেহ মুবারক রক্তে রঞ্জিত করা হয়েছে। এ সময় রাসূল ﷺ-এর হৃদয়ের গভীর থেকে যে ফরিয়াদ বের হয়েছিল, তা বলতেও বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে—

> اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْ ضُعْفَ قُوَّتِيْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ. اِلٰى مَنْ تَكِلُنِيْ؟ اِلٰى بَعِيْدٍ يَجْهَمُنِيْ اَوْ اِلٰى عَدُوٍّ مَلَّكْتَ اَمْرِيْ؟ اِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا اُبَالِيْ! اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمٰتُ.

হে আল্লাহ! কোথায় যাব আর কার কাছে ফরিয়াদ করব! আপনার দরবারেই ফরিয়াদ করছি নিজের শক্তি ও উপকরণের কমতি নিয়ে! জনসম্মুখে আমাকে যে লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে তা নিয়ে!

হে আল্লাহ! আমাকে আপনি কাদের হাওয়ালা করছেন? আমাকে কি আপনি দুশমনদের হাওয়ালা করে দিচ্ছেন যে—তাদের যা ইচ্ছা আমার সঙ্গে করতে পারবে?

পরওয়াদিগার! যদি এতেই আপনার সন্তুষ্টি হয়, আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হন, তাহলে আমিও সন্তুষ্ট। এসব জুলুম-নির্যাতনের আমিও কোনো পরোয়া করি না।

হে রব! আমি আপনার সত্তার নুরের আশ্রয় নিচ্ছি, যার মাধ্যমে অন্ধকার বিদূরিত হয়ে যাবে আর সবকিছু আলোতে ভরপুর হয়ে যাবে।

এরচেয়ে গভীর কোনো ফরিয়াদ হতে পারে? দেখুন, রাসূল ﷺ-এর দুটি মাকাম (মর্যাদা) আছে। মাকামে আবদিয়্যাত আর মাকামে রিসালাত। অর্থাৎ একটি হচ্ছে, আল্লাহর বান্দা হওয়ার মর্যাদা। আরেকটি হচ্ছে রাসূল হওয়ার মর্যাদা। ওপরের ফরিয়াদে তাঁর মাকামে আবদিয়্যাত প্রবলতা লাভ করেছে, إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي—অর্থাৎ যদি এতেই আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হন, তবে আমিও কোনো পরোয়া করি না। পূর্ণ আত্মসমর্পণ!

❀❀❀

রাসূল ﷺ-এর বিপ্লবী কর্মসূচিতে সক্রিয় প্রতিরোধের ধাপ

সবরের ধাপ অতিক্রম করার পর সক্রিয় প্রতিরোধ (Active Resistance)-এর ধাপ আসে। আগেই বলেছি, ইসলামি সংগঠনের নেতৃবৃন্দের জন্য এই ধাপে পা রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুবই নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ একটি বিষয়। রাসূল ﷺ-এর ক্ষেত্রে এই ধাপে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা মোতাবেক ছিল; তাই ভুলের কোনো শঙ্কা ছিল না। কিন্তু ভবিষ্যতে যে আন্দোলনগুলো অস্তিত্বে আসবে—তার নেতৃবৃন্দ যখন এই ধাপে পা রাখার সিদ্ধান্ত নেবেন, তাদের সেই সিদ্ধান্তে কিন্তু ভুলেরও আশঙ্কা থাকবে। নিয়ত ভালো; কিন্তু ভুল হয়েছে—এমতাবস্থায় পার্থিব জীবনে অসফল হলেও পরকালের জীবনে সফলতা নিশ্চিত।

'তাহরিকে শহিদাইন' উনিশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো বিপ্লবী আন্দোলন ছিল। এই আন্দোলনের আহ্বায়ক সাইয়েদ আহমাদ বেরলভি রহ.-এর ভুল হয়েছে, তিনি সঠিক সময়ের আগেই এই পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং পাঠানদের অঞ্চলে গিয়ে শরয়ি আইন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি নিজের হিজরতকে রাসূল ﷺ-এর হিজরতের ওপর অনুমান করে বুঝেছেন যে, যেভাবে হিজরতের পর রাসূল ﷺ

শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, একইভাবে রায়বেরেলি থেকে হিজরত করে আমিও তো এখানে চলে এসেছি; সুতরাং এখন শরিয়তের বিধিবিধান জারি করা উচিত। অথচ তিনি এই বিষয়টি খেয়াল করেননি যে, রাসূল ﷺ তো খোদ মদিনাবাসীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে গিয়েছিলেন, আর তাকে তো কেউ নিজেদের অঞ্চলে এসে শরিয়ত কায়েম করার আহ্বান জানায়নি। এজন্য করণীয় ছিল, কিছু সময় দিয়ে স্থানীয় লোকদের মন-মস্তিষ্ক তৈরি করা। শরিয়তের ব্যাপারে তাদের চিন্তাধারা পোক্ত করা। তাদের অন্তরসমূহে ঈমান ও শরিয়তের প্রতি ভালোবাসাকে বদ্ধমূল করে দেওয়া, যাতে তারা নিজেরা নিজেদের পালন করা অহেতুক প্রথাপার্বণ ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

সাইয়েদ আহমাদ শহিদ রহ.-এর ভুল হয়েছে; কিন্তু যেহেতু এই ভুল পূর্ণ ইখলাস, একনিষ্ঠতা ও ভালো নিয়তের সঙ্গেই হয়েছে, তাই তিনি আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান পাবেন; যদিও পৃথিবীতে তাদের আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। একই কথা সাইয়েদ মওদূদীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তিনিও এক্ষেত্রে ভুল করেছেন। অখণ্ড হিন্দুস্থানে ছয়-সাত বছর পর্যন্ত যেই কর্মপন্থা তিনি অনুসরণ করেছিলেন, পাকিস্তানে এসে তা পরিবর্তন করেন; অথচ তখনও তা পরিবর্তনের সময় আসেনি। আর এই আশায় তিনি নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন যে, হতে পারে লোকেরা আমাদের ভোট দেবে এবং নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আমরা সরকার গঠন করতে সক্ষম হব। যখন সরকার আমাদের হবে, তখন পুরো শাসনব্যবস্থা আর সংবিধানই আমরা বদলে দেবো। শিক্ষাব্যবস্থা ও অর্থনীতিতেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগাব। প্রচারমাধ্যম যেহেতু আমাদের হাতে থাকবে, পুরো জাতিকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে সংশোধন করব। তাদের তারবিয়াত প্রদান করব।

বাহ্যিকভাবে এই চিন্তা অনেক আশাজাগানিয়া ছিল, যদি বিড়ালের গলায় ঘণ্টা লাগানো যায়। তো, নির্বাচনের মাধ্যমে সফলতা লাভ করার এ মরীচিকা যখন তাঁর সামনে আসে, তখন তিনি প্রবঞ্চিত হন। কারণ, এখনও তো এখানকার পরিবেশই পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত হয়নি। সবে হাতেগোনা কিছু লোক তাদের দাওয়াত সম্পর্কে অবগত হয়েছে। এবার আপনিই বলুন, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট তারা কীভাবে লাভ করতে পারে? যাই হোক, এমন ভুল হয়ে থাকে। আর এসব ভুলের ফলে আন্দোলন পার্থিব জগতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়; কিন্তু ভুল যদি সৎ ও ভালো নিয়ত থেকে হয়ে থাকে, তাহলে পরকালের জীবনে প্রতিদান ও সফলতায় কোনো কমতি হবে না।

মদিনায় গৃহীত প্রাথমিক পদক্ষেপ

রাসূল ﷺ হিজরত করে মদিনায় এলেন। তখন আউস ও খাজরায গোত্র ঈমান এনেছিল। অন্যদিকে মক্কা থেকে প্রায় সংখ্যায় দেড়শোর মতো মুসলিমও ঈমানি পরীক্ষা ও মুশরিকদের নির্যাতনের ভয়াবহ সব ধাপ অতিক্রম করে মদিনায় এসেছিলেন। এমন পোক্ত মানুষদের কাজে লাগানোর ব্যাপারে কবি কী দারুণ নির্দেশনা দিয়েছে দেখুন—

تو خاک میں مل اور آگ میں جل' جب خشت بنے تب کام چلے

ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر!

তুমি মাটিতেই মেশো কিংবা আগুনে পুড়ো, ইট হলে তবে লাগবে তোমায় কাজে,
পোক্ত হয়নি—এমন ইটের ওপর কখনও ভিত্তি নির্মাণ করো না যে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ হিজরতের পর প্রতিরোধের (Active Resistance) সিদ্ধান্ত নেন; কিন্তু ছয় মাসে তিনি নিজের পজিশন দৃঢ় করতে তিনটি কাজ করেন।

প্রথমত, মসজিদে নববি নির্মাণ করেন তিনি, যা ছিল একাধারে ইবাদতগাহ, খানকা ও শিক্ষাকেন্দ্র, পার্লামেন্ট ও পরামর্শকেন্দ্র। এই মসজিদ গভর্নমেন্ট হাউসের মর্যাদাও রাখত। এখানেই প্রতিনিধি দলগুলোর আগমন হতো। সহজ কথায়, মুসলমানদের একটি কেন্দ্র অস্তিত্ব লাভ করেছিল।

দ্বিতীয়ত, রাসূল ﷺ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে 'ভ্রাতৃত্বের বন্ধন' তৈরি করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, প্রত্যেক মুহাজিরকেই একজন আনসারের ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে মদিনার আনসাররা তাদের মুহাজির ভাইদের নিজেদের ঘরে, দোকানে ও উপার্জনের যে মাধ্যম ছিল, তাতেও শরিক বানিয়ে নিয়েছিলেন। ভ্রাতৃত্বের এই বন্ধনে এমন দৃষ্টান্তও কায়েম হয়—আনসাররা নিজেদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাটের মাঝখানে দেয়াল নির্মাণ করে তা অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করেন। তারপর নিজে অর্ধেক রেখে বাকি অর্ধেক তাদের মুহাজির ভাইদের দেন। এমনকি এক আনসারির দুজন স্ত্রী ছিল—তখনও পর্দার বিধান নাজিল হয়নি। তিনি নিজের মুহাজির ভাইকে ঘরে নিয়ে যান। বলেন, 'এ হচ্ছে আমার দুজন স্ত্রী। এদের যাকে তোমার পছন্দ হয়, ইশারায় বলো আমাকে। আমি তাকে তালাক দিয়ে দেবো, তুমি বিয়ে করে নিয়ো। আল্লাহর নবি তোমাকে আমার ভাই বানিয়ে দিয়েছেন; তো এটা আমি বরদাশত করতে পারব না যে, আমার ঘরে দু-দুজন স্ত্রী থাকবে আর তোমার কোনো ঘর-সংসার থাকবে না।' এ ছিল আনসার-মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন!

হিজরতের ছয় মাসের মধ্যে রাসূল ﷺ তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করেন তা হচ্ছে, মদিনার স্থানীয় ইহুদি গোত্রগুলোর সঙ্গে সম্মিলিত প্রতিরক্ষাচুক্তি সম্পন্ন করে নেন। আরনল্ড জে. টয়েনবি ও মন্টগমেরি ওয়াট রাসূল ﷺ-এর পদক্ষেপের খুব প্রশংসা করেছেন এবং একে রাসূল ﷺ-এর ব্যবস্থাপনা-যোগ্যতা ও রাষ্ট্র পরিচালনা-দক্ষতার (Statesmanship) অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ সাব্যস্ত করেছেন।

মদিনায় ইহুদিদের তিনটি গোত্র আবাদ ছিল। বনু কাইনুকা[৯], বনু নাজির[১০] ও বনু কুরাইজা[১১]। যারা স্ট্র্যাটেজিকভাবে অনেক ভালো পজিশনে ছিল। মদিনার বাইরে তাদের অনেক ঘাঁটি ও দুর্গ ছিল।

---

৯. **বনু কাইনুকা** : খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মদিনায় আবাস গাড়া তিনটি বিখ্যাত ইহুদি গোত্রের একটি। মদিনায় রাসূল ﷺ ইহুদিদের সঙ্গে যে প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছিলেন, বদর যুদ্ধের পর তারা তা ভঙ্গ করে। এর ফলে মুসলিমরা প্রথমে বনু কাইনুকাকে নির্বাসিত করে। এরা গিয়ে খায়বারে বসতি স্থাপন করে। আর সেখানে গিয়ে পুরোদস্তুর মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে তারা। পরবর্তী সময়ে খায়বার যুদ্ধে এদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়া হয়।—অনুবাদক

১০. **বনু নাজির** : ইহুদিদের একটি বড়ো গোত্র, যারা পিতৃপুরুষের ভূমি ত্যাগ করে মদিনার উত্তর-পূর্বে বুতহান উপত্যকায় আবাদ হয়েছিল। উহুদ যুদ্ধের পর এরা ইসলামের বিজয় দেখে এবং মক্কার মুশরিকদের প্ররোচনায় পড়ে সরাসরি মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে। রাসূল ﷺ মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসার পর ইহুদিদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন, তারা তা ভঙ্গ করে। তারা রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে রাসূল ﷺ তাদের মদিনা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য সময় নির্ধারণ করে দেন; কিন্তু তারা তা আমলে নেয়নি। ফলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয়। ৫ম হিজরিতে তারা মদিনা থেকে নির্বাসিত হয়। তখন কিছু ইহুদি শাম চলে যায় আর কিছু খায়বারে গিয়ে বসবাস শুরু করে।—অনুবাদক

রাসূল ﷺ 'মিসাকে মদিনা' নামে তাদের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা-চুক্তি করেন। বর্তমান সময়ে অনেক আহমককে দেখা যায়, তারা মিসাকে মদিনা বা মদিনা-চুক্তিকে ইসলামি রাষ্ট্রের সংবিধান বলে অভিহিত করে; অথচ এটি ছিল সম্মিলিত প্রতিরক্ষার একটি চুক্তি মাত্র (Joint Defence Pact)। এতে মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল, যদি মক্কার মুশরিকরা মদিনার ওপর আক্রমণ করে বসে, তাহলে মুসলিমদের সঙ্গে মিলে ইহুদিরাও তা প্রতিরোধ করবে। এই চুক্তির মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর অবস্থান আরও সংহত হয়।

বদর যুদ্ধের পূর্বে পরিচালিত অভিযান

মদিনায় নিজের অবস্থান দৃঢ় করার পর রাসূল ﷺ সক্রিয় প্রতিরোধের ধাপ আরও তীব্রতর করে তোলেন। সামরিক অভিযানের জন্য ছোটো ছোটো সেনাদল পাঠাতে শুরু করেন। বদর যুদ্ধের পূর্বেই তিনি এমন

---

১১. **বনু কুরাইজা** : মদিনার বিখ্যাত ও প্রাচীন ইহুদি গোত্র, যারা তাদের নিজেদের ভূমি শাম ছেড়ে মদিনার পূর্বে অবস্থিত মিহিরজরুর বা মাবউস উপত্যকায় এসে আবাস গেড়েছিল। ৫ম হিজরিতে রাসূল ﷺ বনু নাজিরকে যখন নির্বাসিত করেন, তখন বনু কুরাইজা চুক্তি নবায়ন করে; কিন্তু খন্দকের যুদ্ধের সময় তারা শুধু চুক্তি ভঙ্গই করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং মুশরিকদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধে। খন্দক যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী তাদের অবরুদ্ধ করে, যা পুরো এক মাস অব্যাহত থাকে। অবশেষে তারা দরখাস্ত করে, সাআদ ইবনু মুআজ রা. তাদের জন্য যে ফয়সালা দেবেন, তা তারা মাথা পেতে নেবে। তারা মনে করেছিল, সাআদ রা.-এর সঙ্গে যেহেতু তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, সেহেতু তিনি তাদের পক্ষে ফয়সালা করবেন। সাআদ রা. তাওরাতের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে বনু কুরাইজার সকল যোদ্ধাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আর তাদের ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয় গনিমত হিসেবে। —অনুবাদক

আটটি অভিযানে সেনাদলে পাঠিয়েছিলেন; যার মধ্যে চারটিতে রাসূল ﷺ নিজে শরিক হয়েছিলেন আর চারটিতে বিভিন্নজনকে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন। পরিভাষায় যেসব অভিযানে রাসূল ﷺ শরিক হয়েছিলেন, সেগুলোকে 'গাজওয়া' আর যেসব অভিযানে তিনি স্বয়ং শরিক হননি, সেগুলোকে 'সারিয়া' বলা হয়।

এ সময়ে মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। অর্থাৎ, এখন যে পদক্ষেপ (initiative) নেওয়া হয়েছে, তা রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকেই নেওয়া হয়েছে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এই বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য আমাদের কিছু কিছু সিরাতরচয়িতা সিরাতের গ্রন্থগুলোতে বিকৃতি ঘটিয়েছেন। কারণ, আজকাল পশ্চিমা মিডিয়াগুলো প্রোপাগান্ডা শুরু করেছে যে, ইসলাম তরবারির জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইসলাম একটি রক্তপিপাসু ধর্ম, ইসলাম সন্ত্রাসবাদের সবক শেখায় ইত্যাদি। একইভাবে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যখন মুসলিমবিশ্বের ওপর নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করেছে, তখন প্রাচ্যবিদরা ইসলামের বিরুদ্ধে এমন বিষাক্ত অপপ্রচার শুরু করে দিয়েছে। তো এসবের বিপরীতে আমাদের লেখকরা নমনীয় হয়ে ও জবাবদিহির সুরে (Apologetic) বলেন, 'না না, রাসূল ﷺ কিন্তু নিজে থেকে কোনো যুদ্ধ শুরু করেননি। তিনি তো নিজের প্রতিরক্ষায় লড়েছেন মাত্র'। অথচ তাদের এসব কথা শতগুণ মিথ্যা।

মক্কার তরঙ্গহীন পুকুরে রাসূল ﷺ-ই কম্পন সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনিভাবে হিজরতের পর মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে সক্রিয় পদক্ষেপ (Active Resistance) আর সবশেষে সশস্ত্র প্রতিরোধ (Armed Conflict)-এর সূচনাও তিনিই করেছেন।

কবির ভাষায়—

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادیؑ

عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی!

তা বজ্রাঘাত ছিল নাকি পথপ্রদর্শকের (রাসূল ﷺ-এর) আওয়াজ,
আরবের পুরো ভূমিকে প্রকম্পিত করে ছেড়েছিল তাঁর কাজ।

বদর যুদ্ধের পূর্বে একবছর সময়কালে রাসূল ﷺ যে আটটি অভিযান পরিচালনা করেছেন, এর পেছনে থাকা দুটি উদ্দেশ্যের কথা বোঝা যায়। আধুনিক পরিভাষায় বলতে গেলে প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, মক্কার ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ (Economic Blockade) আরোপ করা। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, কুরাইশদের অন্যদের থেকে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন (Isolation Or Political Containment) করে ফেলা। কুরাইশদের কাফেলাগুলো যে রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করত, রাসূল ﷺ সেগুলো অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ করে দেন। এর দ্বারা তিনি কুরাইশদের এই বার্তা দেন যে, এখন এখানে আমার কর্তৃত্ব চলছে। তোমাদের ব্যবসায়ী কাফেলাও আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকছে না। মক্কা থেকে শামে যেতে হতো বদর হয়ে। বদরের অবস্থান মক্কা থেকে প্রায় ২০০ মাইল দূরে। আর মদিনা থেকে এর দূরত মাত্র ৯০ মাইল। কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলাগুলো আটকাতে রাসূল ﷺ সেখানে কয়েকবার ছোটো সেনাদল পাঠান। নিজেও একবার একটি বড়ো সেনাদল নিয়ে যান এবং আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন শামগামী একটি কাফেলার পিছু নেন; কিন্তু তারা ভাগ্যগুণে পালিয়ে যায়।

এমনিভাবে মক্কা থেকে ইয়েমেনগামী কাফেলা তায়েফের পথ ধরে সফর করত। সেদিকেও রাসূল ﷺ একটি সেনাদল পাঠান। এরপর অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, রাসূল ﷺ যেখানেই যান,

সেখানকার গোত্রগুলো তাঁর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। হয়তো তারা আগে কুরাইশদের মিত্র ছিল, এখন রাসূল ﷺ-এর মিত্র হয়ে গেছে অথবা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, না আমরা কুরাইশদের বিরুদ্ধে আপনাকে সাহায্য করব, আর না আপনার বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাহায্য করব। যাই হোক, এই দুই ধরনের চুক্তির কারণেই কুরাইশদের শক্তি ও প্রতিপত্তিতে ভাটা পড়ে যায়। আর রাসূল ﷺ-ও উপর্যুক্ত দুটি উদ্দেশ্য (অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবরোধ) হাসিলে সফল হন।

প্রত্যেক জাতির মধ্যেই দুই ধরনের লোক পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ের ভাষায় তাদের গরল স্বভাবের লোক (Hawks) এবং সরল স্বভাবের লোক (Doves) বলা হয়ে থাকে। মক্কাতেও এই দুধরনের মানুষের উপস্থিতি ছিল। গরল, রক্তগরম ও উগ্র স্বভাবের লোকদের মধ্যে আবু জাহল ও উকবা ইবনে আবু মুয়িত উল্লেখযোগ্য। বিপরীতে সরল, সহনশীল ও নরম স্বভাবের লোকদের মধ্যে উতবা ইবনে রাবিয়া ও হাকিম ইবনে হিজাম ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রথম শ্রেণির লোকদের কথা ছিল, 'অনেক হয়েছে! চলো, এবার মদিনায় আক্রমণ করে মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের ছিন্নমূল করে দিই'। বিপরীতে শেষোক্ত শ্রেণি আক্রমণাত্মক কোনো পদক্ষেপের পক্ষে ছিল না।

উতবা ইবনে রবিয়া ছিল বিচক্ষণ মানুষ। রাসূল ﷺ-এর হিজরতের পর সে কুরাইশের লোকদের বলেছিল, 'দেখো, মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীরা এখান থেকে চলে গেছে (তাদের ভাষায়, আপদ দূর হয়েছে)। এখন মদিনায় গিয়েও মুহাম্মাদ আরাম করে তো বসে থাকবে না; বরং নিজের ধর্মের প্রচার করবে। এতে আরবরা তাঁর বিরুদ্ধে চলে যাবে এবং আরবদের সঙ্গে তাঁর কাশমাকাশ (সংঘাত) শুরু হবে।

এরপর আরবের অবশিষ্ট ভূমি যদি মুহাম্মাদ বিজয় করতে সক্ষম হয়, এতে আমাদের ক্ষতি কী? সে তো আমাদেরই কুরাইশি ভাই। তাঁর বিজয়ের অর্থ আমাদেরই বিজয়। তাঁর বিজয়ে আরবের ওপর আমাদেরই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যদি আরবদের হাতে মুহাম্মাদ ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তোমরা যা কামনা করতে সেটাই তো হয়ে যাবে; তাও আবার তোমাদের তরবারিকে নিজেদের ভাইদের রক্তে রঞ্জিত করা ছাড়াই। দিনশেষে আবু বকর কে? আমাদের ভাই-ই তো নাকি? উমর কে? উসমান কে? উসমান তো বনু উমাইয়াদেরই একজন নাকি? হামজা কে? আবদুল মুত্তালিবেরই তো ছেলে। মুহাম্মাদ কে? আবদুল মুত্তালিবেরই পৌত্র। তোমরা মুহাম্মাদ আর আরবদের তাদের নিজেদের মধ্যে লড়তে দাও। যদি মুহাম্মাদের বিজয় হয়, তবে সমগ্র আরবে আমাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।'

আসলেই সমগ্র আরবে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খিলাফতে রাশেদার পর সাম্রাজ্যের যুগেও সেই আরবদেরই জয়জয়কার ছিল। যাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—বনু উমাইয়া বা বনু আব্বাস—তারা তো আরবই ছিল। উতবা এমন গভীর ভাবসম্পন্ন কিছু কথা বলেছিল, যা কুরাইশ নেতাদেরও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

সরল ও নরম স্বভাবের শ্রেণিটির মক্কায় বেশ ভালো প্রভাব ছিল; কিন্তু এমন দুটি ঘটনা ঘটে, যা কল্পনাতীতভাবে গরল ও যুদ্ধবাজ শ্রেণির পাল্লা ভারী করে দেয়। আর এই সরল শ্রেণির লোকগুলোও তাতে একেবারে চুপসে যায়।

প্রথম ঘটনা হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন কাফেলার পিছু নিয়েছিলেন; কিন্তু তারা ভাগ্যগুণে বেঁচে যেতে সক্ষম হয়—তারা বিপুল পরিমাণ ব্যবসায়ী পণ্য নিয়ে শাম থেকে ফিরছিল।

আবু সুফিয়ান কুরাইশদের কাছে এ বলে দূত পাঠায় যে, 'আমি আশঙ্কাবোধ করছি, মুহাম্মাদের সঙ্গীরা আমাদের কাফেলার ওপর আক্রমণ করবে এবং লুট করে সবকিছু নিয়ে যাবে। তাই যত দ্রুত সম্ভব, আমাদের সাহায্যে সেনাদল পাঠানো হোক'। আবু সুফিয়ানের পাঠানো দূত হন্তদন্ত হয়ে মক্কায় পৌঁছে চিৎকার-চ্যাচামেচি করতে করতে সবাইকে বলে, 'তোমাদের গোত্র, পরিবার ও সম্পদ, সবকিছু শঙ্কার মধ্যে রয়েছে। তাই এখনই সাহায্যের জন্য তোমাদের রওনা হওয়া উচিত'।

অন্যদিকে দ্বিতীয় যে ঘটনাটি ঘটে তা হচ্ছে, রাসূল ﷺ বারোজনের ছোটো একটি দল তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে পাঠিয়েছিলেন। আর তাদের নির্দেশনা দিয়েছিলেন, সেখানে অবস্থান করে মক্কাবাসীর গতিবিধির ওপর নজর রাখো এবং সব সময় আমাদের তা অবহিত করতে থাকো। কিন্তু সেখানে এমন এক পরিস্থিতির তৈরি হয় যে, মক্কার একটি কাফেলার সঙ্গে মুসলিমদের হাতাহাতি হয়ে যায়। সংঘর্ষের একপর্যায়ে এক মুশরিক মারা যায়। দুজনকে মুসলিমরা বন্দি করে। আরেকজন পালিয়ে যায়। মুসলিম বাহিনী কয়েকটি উটে বোঝাই গনিমতের সম্পদ নিয়ে রাসূল ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়। তাদের এমন কাজে রাসূল ﷺ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। কারণ, তাদের কোনো রকমের সংঘর্ষে জড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি। এখন আর কী করার? যা হওয়ার ছিল, তা তো হয়েই গেছে। যে মুশরিক মুসলিমদের কাছ থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিল, নিজের কাপড়চোপড় ছিঁড়ে জোর আওয়াজে কাঁদতে কাঁদতে মক্কায় পৌছায়। মক্কায় পৌঁছে সে লোকদের বলতে থাকে, দেখো সবাই! মুহাম্মাদের অনুসারীরা আমার এ কী দশা করেছে, তারা আমাদের লোকদেরও মেরে ফেলেছে!

এই দুটি সংবাদ একই সময়ে মক্কায় পৌঁছায়। একটি উত্তর থেকে, আরেকটি দক্ষিণ থেকে। হিজরতের পর তখনও পর্যন্ত মুশরিকরা আর কোনো মুসলিমকে হত্যা করেনি। হিজরতের আগে সুমাইয়া ও ইয়াসার রা.-কে আবু জাহল শহিদ করেছিল ঠিক, কিন্তু হিজরতের পর মক্কাবাসীর তরফ থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আর কোনো ধরনের আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

রাসূল ﷺ-এর বিপ্লবী কর্মসূচিতে চূড়ান্ত প্রতিরোধের ধাপ

ওপরে বর্ণিত দুটি ঘটনার কারণে কুরাইশের সরল ও সহনশীল শ্রেণির লোকেরা নিশ্চুপ হয়ে যায়। যার ফলে বদর যুদ্ধের মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর বিপ্লবের কর্মসূচিতে ষষ্ঠ ধাপ অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রতিরোধের সূচনা হয়ে যায়। এটা রাসূল ﷺ এবং কুরাইশদের মধ্যে দু-তরফা যুদ্ধ ছিল, যা প্রায় ছয় বছর পর্যন্ত জারি থাকে এবং এরই মধ্য দিয়ে হক ও বাতিলের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদর যুদ্ধে কুরাইশের ৭০ জন নিহত হয়, যার মধ্যে কুরাইশদের বড়ো বড়ো নেতারাও ছিল। ১৪ জন মুসলিম শহিদ হয়। উহুদ যুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। কয়েকজন সাহাবির ভুলের কারণে ৭০ জন সাহাবিকে শহিদ হতে হয়। বিস্তারিত জানতে আমার রচিত গ্রন্থ 'মানহাজে ইনকিলাবে নববি' পড়তে পারেন। এখানে আমার আগের আলোচনাগুলোতে সিরাতের রং দিচ্ছি মাত্র। অন্য ভাষায় বললে, সিরাত আলোচনা করছি না; বরং সিরাতের ফালসাফা বা দর্শন আলোচনা করছি।

মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে রাসূল ﷺ-এর ছয় বছরের দীর্ঘকালীন যুদ্ধের ধারা দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমজান থেকে শুরু হয় এবং অষ্টম হিজরির ১০ রমজান মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এই সময়ে মুসলিমদের বহু চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে হয়েছে। বিভিন্ন যুদ্ধে

সহস্রাধিক সাহাবি শাহাদাতবরণ করেছেন। উহুদ যুদ্ধে রাসূল ﷺ নিজেও আহত হন। তাঁর দাঁত মুবারক শহিদ হয়। তরবারির আঘাতে শিরস্ত্রাণের দুটি কড়ি ভেঙে তাঁর কপালের হাঁড়ের গভীরে বিঁধে যায়। এক সাহাবি নিজের দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে সেগুলো বের করতে চাইলে উলটো তাঁর দাঁত ভেঙে যায়; কিন্তু কড়িগুলো বের হয়নি। পরে কোনোভাবে সেগুলো বের করা হলে রাসূল ﷺ-এর শরীর থেকে রক্তের ফোয়ারা বয়ে যায়। এত রক্ত বের হয় যে, তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। আর অন্যদিকে সবার মধ্যে প্রচার হয়ে যায়, রাসূল ﷺ শহিদ হয়ে গেছেন।

যে ৭০ জন সাহাবি শহিদ হয়েছেন, তাদের মধ্যে হামজা রা.-ও ছিলেন। রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে হামজা রা.-এর কয়েক ধরনের সম্পর্ক ছিল। তিনি রাসূল ﷺ-এর চাচা ছিলেন, খালাতো ভাই ছিলেন এবং দুধভাইও ছিলেন। আরবরা দুধভাইকে নিজের সৎভাইয়ের মর্যাদা দিত। আবার তিনি রাসূল ﷺ-এর শৈশবের বন্ধুও ছিলেন। ময়দানে যখন তাঁর লাশ পাওয়া যায়, সেটার অবস্থা ছিল গা শিউরে উঠার মতো। নাক-কান কাটা ছিল, বুক চিরে কলিজা চিবানো হয়েছিল! তো, এখানে এসে আপনাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ঘরে বসে বিপ্লব সংগঠিত ও সংঘটিত করা সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ কুরবানির পথ পাড়ি দিতে হয়।

রাসূল ﷺ সশস্ত্র আন্দোলনের পদক্ষেপ নেওয়ার আগে এর জন্যও সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তাই ছয় বছরের এই সশস্ত্র আন্দোলন মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে সুফল দেয় এবং রাসূল ﷺ-এর বিপ্লব পূর্ণতা পায়। সর্বোপরি جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا (সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা বিদূরিত হয়েছে; নিশ্চয় মিথ্যা তো বিদূরিতই হয়ে থাকে)-এর পবিত্র এক দৃশ্যের অবতারণা হয়।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল ﷺ আরও যেসব যুদ্ধে লড়েছেন, মিলিটারি পরিভাষায় সেগুলোকে মপিং আপ অপারেশন[১২] (Mopping-up Operation) বলা যায়। যার মাধ্যমে বিরোধীশক্তিকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করা উদ্দেশ্য ছিল; নতুবা মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়েই কিন্তু আরবে তাঁর বিপ্লবের পূর্ণতা ঘটেছিল।

১২. যুদ্ধ শেষে শত্রুবাহিনীর শক্তি সমূলে উৎপাটন করার জন্য যে অভিযান পরিচালনা করা হয় তাকে 'মপিং-আপ অপারেশন' বলে।

রাসূল ﷺ-এর বিপ্লবের প্রসার

এখন আমরা দুটি বিষয় সুস্পষ্ট করতে চাই। প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, রাসূল ﷺ হুদাইবিয়ার সন্ধির আগে না কোনো মুবাল্লিগ বা দাঈকে আরবের বাইরে দাওয়াতি কাজে পাঠিয়েছেন, আর না কোনো পয়গাম বা পত্র কোনো শাসকের নামে প্রেরণ করেছেন। দশ বছর পর্যন্ত দাওয়াতের সব কাজ মক্কার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এরপর তায়েফের সফরে গেছেন। ইনকিলাব বা বিপ্লবের যে কর্মসূচি—এর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, সূচনালগ্নে তা খুব একটা প্রসার লাভ করে না। মিশনারি অথবা তাবলিগের কাজ যেমন তরমুজ বা শসার মাচার মতো জমিনে ছড়িয়ে পড়ে, বিপ্লবের কার্যক্রম তেমন ছড়ায় না। বিপ্লবী কর্মসূচি এক জায়গায় নিজের শেকড় মজবুত করে তারপর সুশোভিত হয়। যেমনটি আমের ভেতরের শক্ত বিচি ফেটে প্রথমে সেখান থেকে কলি বের হয়। তারপর সেই কলি আমগাছের চারায় পরিণত হয়। এরপর ধীরে ধীরে সেই চারা সুশোভিত এক মজবুত বৃক্ষে পরিণত হয়।

রাসূল ﷺ-এর বিপ্লবের কর্মসূচি ও প্রয়াস মিশনারি চরিত্রের ছিল না; বরং তা ছিল বিপ্লবী চরিত্রের। মাক্কি জীবনের শুরুর দিকে তো রাসূল ﷺ-এর কাছে ধনসম্পদেরও কমতি ছিল না। তখন খাদিজা রা.-এর সম্পদের প্রাচুর্য ছিল, যা তিনি রাসূল ﷺ-এর খেদমতে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। তিনি চাইলে তখনও কায়সার-কিসরা তথা রোম ও

পারস্যের সম্রাটের কাছে এই বার্তা পাঠাতে পারতেন যে, 'আমি আল্লাহর রাসূল। তোমরা আমার ওপর ঈমান আনো!'—কিন্তু তিনি তেমনটা করেননি। হিজরতের পর মদিনায় গিয়ে তিনি বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে চুক্তি করেন; তখনও আরবের বাইরে কোথাও কোনো দাওয়াত বা প্রতিনিধি পাঠাননি। দাওয়াতের জন্য আরবের বাইরে প্রতিনিধি তিনি তখন পাঠিয়েছিলেন, যখন হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং রাসূল ﷺ-কে কুরাইশরা একপ্রকার বিরোধীশক্তি হিসেবে মেনে নিয়েছিল। কুরআন এই সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা সুস্পষ্ট বিজয় বলে অভিহিত করেছে। এই সন্ধি সম্পন্ন হওয়ার পর রাসূল ﷺ কিসরা, হিরাক্লিয়াস, মুকাওকিস, নাজ্জাশি এবং জাযিরাতুল আরবের সীমান্তে বসবাসরত গোত্রগুলোর অমুসলিম নেতাদের কাছে দূতমারফত দাওয়াত ও বার্তা পাঠান।

রাসূল ﷺ-এর দাওয়াতি বার্তার প্রতিক্রিয়ায় রাজা-বাদশাহদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের আচরণ সামনে আসে। গাসসানের শাসক—যে কিনা হিরাক্লিয়াসের অনুগত ছিল—রাসূল ﷺ-এর পাঠানো দূত সাহাবি হাসির ইবনে উমাইর রা.-কে শহিদ করে দেয়। যার কিসাস নিতে রাসূল ﷺ সেনাবাহিনী পাঠান। আর এতে মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় তাবুক অভিযান পরিচালিত হয়। এভাবেই রাসূল ﷺ-এর বর্তমানেই তাসদিরে ইনকিলাব বা বিপ্লবের প্রসারের (Exporting of Revolution) ধাপেরও সূচনা হয়ে যায়। আরেকটু সহজ করে বললে, রাসূল ﷺ-এর জীবনকালেই শুধু আরবের মধ্যেই বিপ্লব পূর্ণতা লাভ করেনি; বরং তাঁর হাতে আরবের বাইরেও বিপ্লবের সম্প্রসারণ কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর তিনি এর জিম্মাদারি উম্মতের কাঁধে অর্পণ করে যান।

রাসূল ﷺ-এর বিপ্লবী দর্শন এবং আজকের প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, পানি অনেক বয়ে গেছে। যুগ অনেক বদলে গেছে। অবস্থা ও পরিস্থিতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। তাই এখনকার সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান যুগেও কি বিপ্লব সংগঠিত করার নববি রূপরেখার ওপর হুবহু আমল করা হবে, নাকি তাতে ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে?

আমার মনে হয়, আমরা বিপ্লবের যে প্রধান ছয়টি ধাপের কথা আলোচনা করেছি, তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি ধাপে পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, আমাদের বিপ্লবের দর্শন আজও সেই তাওহিদের দর্শনই। আজও আমাদের সেই ঈমানেরই দাওয়াত দিতে হবে, যার মূল উৎস—কুরআন। আপনি যদি এমন কিছু ভাবেন যে আমরা মুসলিম, আমাদের মধ্যে ঈমান তো আছেই। এমন কিছু ভেবে থাকলে আপনাকে আমি বলব—না, আপনার এমন ভাবনা যথার্থ ও যথেষ্ট নয়। কারণ, ইসলাম এক জিনিস আর ঈমান আরেক জিনিস। আমরা মুসলমান; কারণ, আমাদের জন্ম মুসলিম পরিবারে। আমাদের মাতা-পিতা মুসলমান। কিন্তু ঈমান আমাদের ধ্যান-জ্ঞান ও মন-মননে নিজেদেরই তৈরি করতে হবে। তাওহিদ, আখিরাত ও রিসালাতের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসসমৃদ্ধ ঈমান আমাদের প্রথম এবং সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন।

কবির ভাষায়—

یقیں پیدا کر اے ناداں یقیں سے ہاتھ آتی ہے

وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری!

দৃঢ়বিশ্বাস তৈরি করো হে নাদান!
বিশ্বাসেই তো অর্জন হয় দরবেশি,
যার সামনে নত হয়ে যায় চীনের বাদশাহ ফাগফুরি!

রাসূল ﷺ-এর বিপ্লবের মাধ্যম ছিল কুরআন। আজও এই কুরআনই আমাদের বিপ্লবের মাধ্যম। তাই আমাদের 'রুজু ইলাল কুরআন' তথা কুরআনের দিকে ধাবিত হওয়ার দাওয়াতকে ব্যাপক করতে হবে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে কুরআনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। আমার মতে, কুরআনের সাদৃশ্য হচ্ছে চুম্বকের মতো, যা সচ্চরিত্রের অধিকারী লোকদের নিজের দিকে আকর্ষণ করে। যাদের চরিত্র বিগড়ে গেছে, তাদের ওপর কুরআন কোনো প্রভাব ফেলবে না; যেমনিভাবে চুম্বক শুধু লোহার টুকরাকেই আকর্ষণ করে, কাঠের টুকরাকে আকর্ষণ করে না। এ জন্যই সমাজে কুরআনি চুম্বকের প্রসার করা খুবই জরুরি।

আলহামদুলিল্লাহ! আমি চল্লিশ বছর ধরে এই শহরে (লাহোরে) কুরআনের দাওয়াত প্রসারের চেষ্টা করছি। আমাকে তো কেউ কেউ 'কুরআনের কাওয়াল'[১৩] অভিধায়ও ডেকে থাকেন। আমিও আনন্দের সঙ্গে এই উপাধি কবুল করেছি। সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, আমি নিজের মধ্যে নিম্নোক্ত চরণটির বাস্তবতা ও মিষ্টতা অনুভব করি—

---

১৩. যে ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের কথা বেশি বেশি বলেন, তাকে সে বিষয়ের 'কাওয়াল' বলা হয়।

ما ہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم-

الا حدیث دوست کہ تکرار می کنیم

যা কিছু পড়েছি, ধারণ করেছি ভুলেই গিয়েছি সব,
তবে ভুলিনি বন্ধুর কথামালা, হয় দিবানিশি অনুভব।

মেডিকেলে পড়াশোনা করেছিলাম, কিন্তু সবকিছু ভুলেছি। তবে হ্যাঁ, কুরআন হচ্ছে বন্ধুর কথা—আল্লাহর কালাম। আমি সব সময় এর আলোচনাই করি। যাহোক, আমাদের প্রথম কাজ হবে এটি। এরপর যারা এই চুম্বকের দিকে আকর্ষিত হবে, তাদের বাইয়াতবদ্ধ করে সংগঠিত করা হবে। রাসূল ﷺ বাইয়াতের তরিকাকে আমাদের জন্য আদর্শ হিসেবে রেখে গেছেন। এর বুনিয়াদ দুনিয়াবি কোনো সংগঠনের রীতিনীতিতে হবে না। এটি দু-তিন বছরের কোনো অস্থায়ী সংগঠনের মতো হবে না। এমনকি এতে আমির নির্বাচিত করার মতো কোনো বিষয়েরও অবতারণা করা হবে না; বরং যে দাঈ সবাইকে দাওয়াত দিয়েছেন, যার কথাকে লোকেরা সত্যায়িত করে এবং আস্থা রেখে একত্রিত হয়েছে, তার হাতেই নিজেদের হাত এই অঙ্গীকারের সঙ্গে রাখতে হবে যে, যতদিন আপনি শরিয়তের গণ্ডির মধ্যে থাকবেন, আমরা আপনাকে মেনে চলব। নিজেদের পরামর্শ তো অবশ্যই পেশ করব, কিন্তু সিদ্ধান্ত আপনারই হবে।

যারা এ অঙ্গীকার করে দাঈর কাছে সমবেত হবে, এবার তাদের তারবিয়াত করা হবে। কুরআনকে প্রোথিত করা হবে তাদের হৃদয়ের গভীরে। তাদের রাত্রিজাগরণ ও ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর রাস্তায় দান করা)-এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হবে। মনে রাখবেন, ইনফাক (দান) নিফাক (মুনাফিকি, কপটতা, দ্বিমুখিতা)-কে ধীরে ধীরে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেয়।

এরই সঙ্গে সবরের (Passive Resistance) ধাপও শুরু হয়ে যাবে। এ যুগে সবরের ধরন কেমন হবে? আমরা এখনও প্রশাসনের জন্য কোনো আশঙ্কার কারণ নই। মক্কার তখনকার ছোটো আবাদিতে তো একশো-দেড়শো মানুষও হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল; কিন্তু এখানকার পনেরো কোটি আবাদির মধ্যে দু-চার হাজার মানুষ যদি এমন হয়, তাতে তেমন কিছু যায় আসে না। তাই তাদের ওপর প্রশাসনের দিক থেকে কোনো বাধা বা চাপও আসবে না। তবে হ্যাঁ, তাদের শরিয়তের বিধানের ওপর আমল করার ক্ষেত্রে পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে। তাদের ঘুস নেওয়া ছাড়তে হবে, তখন তাদের ঘরের লোকেরাই তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে। কারণ, এতে করে যেখানে নাশতায় আগে তারা ডিম-পরোটা খেত, এখন আর সেটা খেতে পারবে না। হয়তো শুকনো রুটিতেই নাশতা সারতে হতে পারে। এই দৃশ্যের কথাই সূরা তাগাবুনে আল্লাহ তুলে ধরেছেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ ... ﴿١٤﴾

> হে মুমিনরা, নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানসন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের দুশমন। অতএব, তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। (সূরা তাগাবুন : ১৪)

নিজের ঘরে নারীদের আপনি শরয়ি পর্দা করাবেন—তো দেখবেন, পুরো সমাজ আপনাকে বয়কট করে বসবে। এ তো চলছে সবরের ধাপ। আল্লাহ করুন—সে ধাপও দ্রুত আসুক যে, আমাদের সঙ্গে এত এত লোক একত্রিত হয়ে যাবে, যা দেখে কায়েমি শক্তিও শঙ্কিত হয়ে উঠবে আর এটা ভাবতে বাধ্য হবে যে, এরা তো আমাদের প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার জন্য শঙ্কার কারণ হতে পারে। এরপর তারা চাপ প্রয়োগ শুরু করবে। আর আমরাও ধীরে ধীরে সফল বিপ্লবের ধাপগুলো অতিক্রম করতে শুরু করতে থাকব, ইনশাআল্লাহ।

বর্তমান যুগে পরিস্থিতি এমনভাবে বদলে গেছে যে, বিপ্লবের শেষ ধাপ অর্থাৎ সশস্ত্র প্রতিরোধ (Armed Conflict) নিয়ে আসলেই ইজতিহাদের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, রাসূল ﷺ-এর যুগে একদিকে মুসলিম আর আরেকদিকে কাফিরদের অবস্থান ছিল। যুদ্ধরত কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে সংশয়ে পড়ার কোনো অবকাশই ছিল না। বিপরীতে বর্তমান যুগের অবস্থা হচ্ছে, এদিকেও মুসলমান আর ওদিকেও মুসলমান। আমাদের শাসকরা যেমনই হোক, দাবি তো করে তারাও মুসলমান।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, সে যুগে শক্তির পার্থক্য মোটাদাগে শুধুই সংখ্যার দিক থেকে ছিল। এদিকে ৩১৩ জন স্বেচ্ছাসেবী মুজাহিদ, তো ওদিকেও ছিল ১ হাজার যোদ্ধা। কাফিরদের দলেও কিন্তু বহুসংখ্যক যোদ্ধাই নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সশস্ত্র ছিল না। এমনও ছিল না যে, তাদের কাছে ট্যাঙ্ক, কামান, মিসাইল ছিল আর মুসলিম মুজাহিদদের কাছে শুধু তরবারি। রাসূল ﷺ-এর সেনাবাহিনীতে শুধু দুটি ঘোড়া ছিল, আর কাফিরদের কাছে প্রায় একশোর মতো। মোটকথা, সংখ্যায় পার্থক্য ছিল বটে; কিন্তু শক্তির ধরন ও কিসিমে কোনো পার্থক্য ছিল না। উপরন্তু, সামাজিক পরিবর্তন (Social Evolution)-এর কারণে আজকের যুগে যুদ্ধ ছাড়াই সরকার পরিবর্তনের সম্ভাব্য অনেক পথ বের হয়েছে। কারণ, বর্তমান সময়ে দেশ ও সরকার—দুটোকে ভিন্ন ভিন্ন বলা হয়। শহরের মানুষ দেশপ্রেমিক হয়; সরকারপ্রেমিক নয়। সরকার বদলাতে পারা তো জাতির অধিকার; কিন্তু তদানীন্তন সময়ে সামাজিক অবস্থা বর্তমান সময়ের মতো ছিল না বিধায় দেশ ও সরকার দুটোই মিলেমিশে একাকার ছিল।

বর্তমান যুগে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই সরকার পরিবর্তনের দুটি প্রক্রিয়া হতে পারে। একটি নির্বাচনী প্রক্রিয়া, আরেকটি গণ-আন্দোলন (Agitation)। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সংবিধান বা ব্যবস্থা বদলানো সম্ভব নয়—নির্বাচন যতই স্বচ্ছ আর ইনসাফপূর্ণই হোক না কেন। মনে রাখতে হবে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় শুধু সংবিধান পরিচালনাকারীই বদলানো যায়; সংবিধান নয়।

কারণ, রাষ্ট্রে শক্তির যে ধারার জোর বেশি থাকবে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ফল সে ধারার অনুকূলেই যাবে—এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। রাষ্ট্রে যদি জায়গিরদারি-ব্যবস্থার জোর বেশি থাকে, তাহলে কোনো জায়গিরদারই নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসবে। যদি পুঁজিবাদী ধারার জোর বেশি থাকে, তাহলে কোনো পুঁজিবাদীই নির্বাচিত হবে। আর যেহেতু নাগরিক মানসিকতার মধ্যে পরিবর্তন আসতেই থাকে, সে বিবেচনায় ক্ষমতায় আসা দলেরও পরিবর্তন হতে থাকে। কখনও এ দল ক্ষমতায় থাকে, তো কখনও অন্য দল ক্ষমতায় আসে। এবার আপনিই বলুন, জায়গিরদার আর পুঁজিবাদীরা যদি নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতাসীন হয়, তবে কি তারা জায়গিরদারি-ব্যবস্থা আর পুঁজিবাদী সিস্টেম বিলুপ্ত করে দেবে? এটা কখনও সম্ভব? এমনই যদি হয়, তাহলে তো সে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারবে। অতএব, নির্বাচনী প্রক্রিয়া কোনো দেশের সংবিধান পরিচালনাকারী গোষ্ঠীকে বদলাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে; সংবিধান বা ব্যবস্থা বদলানোতে তেমন কোনো ভূমিকা রাখে না।

আমেরিকাতে দুটি পার্টি আছে—রিপাবলিকান পার্টি (Republican Party) আর ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (Democratic Party)। দুই পার্টির দাবিই হচ্ছে, আমরা এই সংবিধান বা ব্যবস্থাকে বেশি ভালোভাবে

পরিচালনা করতে পারব। তাদের প্রচারণায় পার্থক্য হলো, শুধু করনীতি, স্বাস্থ্যনীতি বা অভিবাসন নীতিতে পার্থক্য হবে। ব্রিটেনেও কনজারভেটিভ পার্টি (Conservative Party) আর লেবার পার্টি (Labour Party) নামে দুটি দল আছে। সংবিধান বা রাষ্ট্রনীতি নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। তবে হ্যাঁ, আমেরিকায় যদি কমিউনিস্ট থাকে, তবে তারা গিয়ে সংবিধান বা রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে কথা বলবে। এখন কথা হচ্ছে, আমেরিকায় কমিউনিস্ট আছে কি না? সিয়াটল (Seattle) ও ওয়াশিংটনে গ্লোবালাইজেশনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায়—সেখানেও কমিউনিস্টদের উপস্থিতি আছে। কিন্তু এ কথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট যে, তারা কখনও নির্বাচনের পথ বেছে নেবে না। কারণ, নির্বাচনের মাধ্যমে সেখানে তারা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না—প্রশ্নই আসে না।

বর্তমান যুগে পদক্ষেপ গ্রহণের ধরন

এমতাবস্থায় আমাদের সামনে কেবল একটি পথই অবশিষ্ট থাকে। আর তা হচ্ছে, একটি শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খল গণ-আন্দোলন—যাতে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা আক্রমণাত্মক ভাব থাকবে না এবং সরকারি ও বেসরকারি কোনো সম্পদেরও ক্ষতি করা হবে না। তবে হ্যাঁ, আন্দোলনকারীদের নিজেদের জান বিলিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি পর্যন্ত থাকতে হবে। একে আমি 'একতরফা যুদ্ধ' শব্দে ব্যক্ত করে থাকি। লোকেরা সড়কে নেমে অনৈতিকতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। সরকার ও প্রশাসনকে তারা নিজেদের দাবির কথা জানিয়ে দেবে যে, আমরা অন্যায়-অবিচার বন্ধ করার জন্য অনেক অনুরোধ করেছি। তোমাদের কাছে আমরা এ বলে হাতজোড় করেছি যে, আল্লাহর ওয়াস্তে সুদ বন্ধ করে দাও; কিন্তু তোমরা শোনোনি।

তাই এখন আমরা পিকেটিং করব, উচ্চবাচ্য করব, ব্যাংক ঘেরাও করব এবং এই সুদি অর্থনীতিকে নিজেদের প্রাণ থাকতে আমরা মেনে নেব না। আমাদের দমন করবে তোমরা? তো চালাও গুলি, চালাও গুলি আমাদের ওপর!

আমার মতে, বর্তমান যুগে বিপ্লবের জন্য এটিই সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি। যদি আমরা উত্তেজিত হয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিই, তো কার বিরুদ্ধে তুলব? সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে, নাকি এয়ারফোর্সের বিরুদ্ধে? আমাদের আগের সরকারগুলো কি বেলুচিস্তানে দু-দুবার এয়ারফোর্স ব্যবহার করেনি? এয়ারফোর্সের মাধ্যমে হাফেজ আল আসাদ একদিনে হাজারো ইখওয়ান-কর্মীকে শহিদ করে দেয়নি? তাদের অফিস ও কেন্দ্রগুলো বোম্বিং করে ধ্বংস করে দেয়নি? তাহলে বোঝা গেল, বর্তমান যুগে মোকাবিলা অসম পর্যায়ের (unequal) হয়ে যায়। তবে যেখানে সম্ভব 'দু-তরফা যুদ্ধ'-ও হতে পারে। পাহাড় অধ্যুষিত দেশে গেরিলা যুদ্ধও হতে পারে। এসব পদ্ধতি হারাম নয়। দ্বীন ও শরিয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল ﷺ জিহাদ করেছেন। তো, আমরাও দ্বীন ও শরিয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করতে পারি।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব মতে, মুসলমান শাসক যদি ফাসিক হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে। প্রথমে জবানিভাবে 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' (সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ) করা হবে। যদি তাতে কোনো ফায়দা না হয়, তাহলে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' করা যেতে পারে। বলছিলাম, যুদ্ধ যদিও জায়েয, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তা আমলে আনা অনেক কঠিন। এখনকার শাসকদের বিরুদ্ধে 'এক তরফা যুদ্ধ'-ই সবচেয়ে উপযোগী পদক্ষেপ।

আজকের দিনে যদি কোনো সরকারের বিরুদ্ধে এমন আন্দোলন চলে, তো স্পষ্টতই তা থামানোর চেষ্টা করা হবে। শুরুর দিকে সেনাবাহিনীও সরকারের আদেশ মানবে এবং আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালাবে; কিন্তু একটা সময় এসে সেনারা এ বলে থেমে যাবে যে, 'না, স্বদেশিদের ওপর আমরা আর একটি গুলিও ছুড়তে পারব না'। দেখুন, আপনার দেশের সেনাবাহিনী কোনো জবরদখলকারী বাহিনী নয়; এটি জাতীয় বাহিনী। আর যারা তাদের সামনে আন্দোলনের জন্য দাঁড়াচ্ছে তারাও তো ভিনদেশি নয়। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগে[১৪] জেনারেল ডায়ার[১৫] হাজারো মানুষকে হত্যা করেছিল, এতে তার দুঃখ কীসের? সে তো ইংরেজ। আর যাদের সে হত্যা করেছে, তারা ছিল হিন্দুস্থানি মুসলমান, হিন্দু বা শিখ। মনে রাখবেন, নিজের জাতিকে বা নিজের দেশের মানুষকে মারা এত সহজ নয়। একটা সময় পর্যন্ত তো নির্দেশ বাস্তবায়ন করে যায়; তারপর এমন এক পর্যায় আসে, যখন সেনা-কর্মকর্তারা এরূপ পাশবিক নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানায়।

যেমন, লাহোরে ব্রিগেডিয়ার মুহাম্মাদ আশরাফ গোন্দল—আল্লাহ তাকে উত্তম বদলা দান করুন—এ বলে অস্বীকার করেছিলেন যে, আমরা লোকদের ওপর আর গুলি চালাতে পারব না। তাকে দেখে আরও দুজন ব্রিগেডিয়ারও একই পথ বেছে নেন। এতে ভুট্টো সাহেবও যা বোঝার বুঝে নেন। দুদিন আগে রাষ্ট্রীয় চ্যানেলে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি নিজের চেয়ারের হাতল ধরে বলেছিলেন, 'আমার চেয়ার অনেক মজবুত'। আমার চোখে আজও সেই দৃশ্য ভাসে। কিন্তু যখন লাহোর থেকে সেনাদের ব্যাপারে সংবাদ আসে,

---

১৪. Jallianwala Bagh

১৫. Reginald Edward Harry Dyer

তখন তার সেই চেয়ারই প্রকম্পিত হয়। বাধ্য হয়ে তিনি পিএনএ-র (Pakistan National Alliance) কাছে আলোচনার বার্তা পাঠান। সে যাই হোক, ইসলামি বিপ্লবের জন্য কিন্তু প্রাণের কুরবানি দিতেই হবে; তা ছাড়া বিপ্লব সংঘটিতই হবে না।

বর্তমান যুগে আমাদের সামনে ইরানিদের দৃষ্টান্ত রয়েছে। তারা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে বিপ্লব সংঘটিত করে দেখিয়েছে। যদিও ইরানি বিপ্লবকে আমি সঠিক ইসলামি বিপ্লব মনে করি না। সত্যি বলতে, আমার কাছে তা আসল ও সফল বিপ্লবও নয়। কারণ, আসল বিপ্লব সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না; বরং তা নিজের সীমানা ছাড়িয়ে দূর-দারাজে ছড়িয়ে পড়ে। ভুলে গেলে চলবে না, 'তাসদিরে ইনকিলাব' (Export of Revolution) একটি আসল ও সফল বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বটে। ১৯৮৪-৮৫ খ্রিষ্টাব্দে আমি মসজিদে দারুস সালাম, বাগে জিন্নাতে 'ইরানি বিপ্লব কি ইসলামি বিপ্লব'—বিষয়ে খুতবা দিয়েছিলাম। তারপর 'মানহাজে ইনকিলাবে নববি' বিষয়ে ১১টি ধারাবাহিক বক্তব্য দিয়েছিলাম; সেগুলোরই সংক্ষিপ্ত রূপ আপনাদের সামনে পেশ করলাম। সেখানে প্রদত্ত সেই ১১টি বক্তব্য 'মানহাজে ইনকিলাবে নববি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হয়েছে। আপনাদের কারও যদি এ বিষয়ে আরও জানার আগ্রহ থাকে, তবে গ্রন্থটি পড়তে পারেন।

যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

বর্তমান যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, বিপ্লবের তরিকা নির্ণয় করতে পারা এবং সুস্পষ্টভাবে তা বুঝতে পারা। বর্তমান যুগের মুসলমানদের মধ্যে জযবার কোনো কমতি নেই। হাজারো মানুষ নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করছে। কাশ্মীরিদের উদ্যম ও কুরবানি পুরো পৃথিবী দেখছে; অথচ কাশ্মীরিদের ব্যাপারে বলা হয়, তারা তো লড়াকু জাতিই নয়। এখন দেখুন, তাদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে লড়ার জযবা ও মানসিকতা তৈরি হয়েছে। পাকিস্তান থেকে সেখানে গিয়ে কত মানুষ যে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছে, তার হিসাব করাও তো মুশকিল। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এসব ইসলামি বিপ্লবের তরিকা বা কর্মপন্থা নয়। এসব করে কোথাও সফলতা আসবে না। এসব তরিকা অবলম্বন করে আপনি শুধু নিজের ক্ষোভই মেটাতে পারবেন; এরচেয়ে বেশি কিছু নয়।

দেখুন, আপনি আফ্রিকায় গিয়ে আমেরিকার দুটি দূতাবাস ধামাকা আক্রমণ করে উড়িয়ে দিলেন। এতে দশ-পনেরোজন আমেরিকান নিহত হলো; কিন্তু একই সঙ্গে সেখানকার অধিবাসী দুশোজন আফ্রিকানও মারা গেল। ফায়দা কী হলো? শুধু এটুকু কাজ হলো যে, আপনার ক্ষোভ মিটেছে। তো, সহজ ভাষায় বললে, এসব তরিকা

অবলম্বন করে কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। নির্বাচনের মাধ্যমেও তেমন কিছু অর্জিত হবে না। এসব তরিকায় ইসলামি বিপ্লব বাস্তবায়িত হওয়া আসলে স্বপ্নের মতোই অবাস্তব। আমি মানছি, আপনার ইখলাস আছে; কিন্তু এসব তরিকা তো গলদ। ইসলামি বিপ্লবের জন্য মুহাম্মাদি তরিকা ও কর্মপন্থা অনুসরণ করতে হবে। আপনিই বলুন, আরবে নির্বাচনের মাধ্যমে রাসূল ﷺ সফল হতে পারতেন? কুরআন তো বলে—

﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...﴾ ﴿١١٦﴾

> আর যদি আপনি পৃথিবীর বেশিরভাগ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। (সূরা আনআম : ১১৬)

নির্বাচনে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যালঘুতার ব্যাপার থাকে। আমি এর চেয়েও আরও বহু পরের উদাহরণ দিচ্ছি। বলুন তো, আয়াতুল্লাহ খামিনি কি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে পারত? কক্ষনো না! আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের আর প্রতারিত করবেন না। আজ পুরো মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর আজাব থেকে কেবল এ সুরতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে যে, অন্ততপক্ষে কোনো একটি রাষ্ট্র প্রকৃতার্থে দ্বীন কায়েম করে পুরো পৃথিবীকে দেখিয়ে আহ্বান করবে, দেখো সবাই, আসো, দেখে যাও! এ হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম। ইসলামের বরকত দেখো সবাই। ইসলামের কল্যাণ দেখে যাও সবাই। এখানের সমতা ও ভ্রাতৃত্ব দেখে যাও। এখানের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা দেখে যাও। যদি আমরা এমনটা করতে না পারি, তবে আল্লাহর আজাব আরও কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকবে। কবির ভাষায়—'আর কিছুদিন পর তো শূন্যলোক থেকেও রক্ত ঝরবে!'

দিন দিন আজাব বাড়তে থাকবে; কমবে না। আরববিশ্ব সবচেয়ে বেশি এ আজাবের শিকার হবে। কারণ, আল্লাহ তাদের ওপর সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের মাঝেই রাসূল ﷺ-কে পাঠিয়েছেন। কবির ভাষায়—'এ মহান মর্যাদা তো তারাই পেয়েছে, যারা এ (নবির জাতি হওয়ার) মাহাত্ম্য লাভ করেছে।' আরেকটা কারণ হচ্ছে, তাদের ভাষায় আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ কিতাব নাজিল করেছেন। আমরা তো চাটাই-ঘষা মেহনত করে আরবি শিখেছি, তারপর কুরআন বুঝেছি, কিন্তু তাদের তো এটা মাতৃভাষা ছিল।

যাই হোক, আমাদের দেশের স্থায়িত্ব ও কল্যাণ এতেই রয়েছে যে, এখানে ইসলামি বিপ্লব আসবে, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে; এটিই তার টিকে থাকার কারণ। নতুবা আমাদের দেশের অবস্থা তো এখন পুরোপুরি তেমন, যেমন অবস্থার দৃশ্য সূরা ওয়াকিয়ার শেষ রুকুতে তুলে ধরা হয়েছে। যখন কেউ মুমূর্ষু অবস্থায় থাকে আর পাশে তার আত্মীয়স্বজন দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে যে, সে বিদায় নিচ্ছে। কিন্তু তারা তখন অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের কিছুই করার থাকে না। তাদের অবস্থার কুরআন এভাবে চিত্রিত করেছে যে—

فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٨٧﴾

> তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও, তাহলে তোমরা ওটা (রুহ) ফিরিয়ে দাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো! (সূরা ওয়াকিয়া : ৮৬-৮৭)

একইভাবে আমিও বলছি, আমাদের দেশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একসময় দেখবেন, আপনার অট্টালিকা আর আপনার থাকবে না, অন্য কারও হয়ে যাবে। আপনার কলকারখানা আর আপনার

থাকবে না; অন্য কেউ এর মালিক হয়ে যাবে। কবির ভাষায়, 'বসতিগুলোর অবস্থা দেখো; একেবারে বিরান বধ্যভূমিতে পরিণত হবে!' যদি এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে পাকিস্তানের আর বাকি থাকারও অধিকার থাকবে না। আমি 'বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইসলাম ও পাকিস্তানের ভবিষ্যত'—প্রসঙ্গে দুটি বক্তব্য দিয়েছিলাম : [১] বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইসলামের ভবিষ্যৎ। [২] পাকিস্তান কি ধ্বংস হতে শুরু করেছে? এবং এখনও কি মুক্তির কোনো পথ খোলা আছে?

মুক্তির একটি পথই খোলা আছে আর তা হচ্ছে, ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। দুঃখের বিষয়, যারা এর ইচ্ছা রাখে, জযবা লালন করে—তাদের সামনে যেহেতু সুস্পষ্ট কোনো কর্মপন্থা নেই; এজন্য তারা এদিক-ওদিক ধাক্কা খেতে থাকে। আমি রাসূল ﷺ-এর সিরাত থেকে আহরণ করে আপনাদের সামনে বিপ্লবের এমন একটি কর্মপন্থা পেশ করেছি, যা অনুসরণ করলে সফলতা লাভের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। নতুবা আপনার ইখলাস তার জায়গায় পড়ে থাকবে; কিন্তু সফলতার দেখা মিলবে না।

❀❀❀

আমার যা কিছু বলার ছিল—আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় তা বলতে পেরেছি। সবশেষে আমি নিজের জন্য, আপনাদের জন্য এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।